মূল্য ঃ ৫ টাকা

সত্যের পথ

যারা ভগবানকে চায় শুধু তাদের জন্য

২২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

এপ্রিল, ২০২৫
চৈত্র, ১৪৩১

সূচীপত্র

২২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

চৈত্র ১৪৩১/এপ্রিল ২০২৫

বিশ্বমাঝেই রয়েছেন বিশ্বপতি		৩
সাধন প্রয়াস	অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
হয়েছি শরণাগত শ্রীভগবানে	সায়ক ঘোষাল	১৭
দিব্য আলো	পার্থ সুন্দর ঘোষ	১৮
ফুটে আছেন ব্রহ্মকমল, ব্রহ্ম স্বয়ং	মনোজ বাগ	১৮
আমিই আছি	শিপ্রা ব্যানার্জী	২৩
প্রভু গ্রহণ করো	সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)	২৪
শান্তি প্রদায়িনী মা	ভক্তিপ্রসাদ	২৪
অনির্বাণজীর চরণপ্রান্তে	আশুরঞ্জন দেবনাথ	২৫

সম্পাদক : **রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রকাশক ও মুদ্রক : **বিবুধেন্দ্র চ্যাটার্জী**
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

মুদ্রণের স্থান : ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

দাম : **৫ টাকা**

সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি
(চতুর্থ তল)
কোলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ ঃ ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট
সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

সাক্ষাতের সময় ঃ
রবিবার বিকেল পাঁচটার পর

সম্পাদকীয়

বিশ্বমাঝেই রয়েছেন বিশ্বপতি

বিশ্বমাঝেই ভগবান বিরাজ করেন সবসময়ে। কালের সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই মহাকাল স্বয়ং এই বিশ্বমাঝে জীবনের স্পন্দন তুলেছেন ফুটিয়ে। জীবন হয়েছে ভাস্বর জগতের সব ক্ষণ প্রবাহেই। যেমন করে হয়েছে জীবন ছন্দের মূর্ত হওয়াতে তেমনি হয়েছে প্রতিভাত নিত্যদিনের সহজ সরল সত্যের জগৎ আবর্তন আর বিশেষ করে জীবনের জালে বিস্তার। মহামায়ার জাল বিস্তারের পথ সূচিত হয়েছে নিত্য দিনের কর্মের অঙ্গীকার ফুটে ওঠা বন্ধনের মধ্য দিয়ে। প্রতিটি কর্ম আর কর্মবিস্তার ক্রমাগতভাবে সৃষ্টির মাঝে করে চলেছে ক্ষণ সত্যের দৃপ্ত বন্ধন। ক্ষণ সত্যই হয়ে উঠেছে এখন শাশ্বত সনাতনী জীবন সত্য। মহিমাময় এই জীবন সদাই আবেষ্টনকারী। জীবনের সূচনার যে জৈব ভিত্তি সেখানেই গড়ে উঠেছে প্রথম মাত্রার জৈব জাল। জৈব জাল তার কড়ি বিছিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয় জীবনের বেড়ে ওঠার সব পর্বে পর্বে। জীবনের বেড়ে ওঠার পর্বগুলি হয়েছে একটির পর আরেকটি জীবন সূত্রের গড়নে বেঁধে রাখা। যখনই জীবন কর্ম সূচনা থেকে চলতে চায়, এগিয়ে বেড়ে উঠতে চায় নতুন কোন বন্ধন।

অসক্ত বুদ্ধি ঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম সিদ্ধিম পরমাং সন্ন্যাসেন অধিগচ্ছতি।। (গীতা. ৪৮/৪৯)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভাগবতী রূপ উন্মোচন করেছেন অর্জুনের কাছে বিশ্বরূপ দর্শন করাবার মধ্য দিয়ে। অর্জুন বুঝে গেছে তারই সখা স্বয়ং ভগবানের অবতীর্ণ রূপ। পূর্ণ সনাতন তিনি আজ উপস্থিত অর্জুনের প্রকাশ জীবনের সম্মুখে হয়ে রয়েছেন সারথী। তিনিই সত্য জ্ঞান অমূর্ত, তিনিই শাশ্বত সত্যের অমৃতময় পরমের আশ্রয়রূপ। অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশবাণী দিয়েছেন তারই রূপপ্রকাশ হয়েছে নানা যোগপথের প্রস্তাবনায়। সর্বপ্রথমে, মধ্যে ও অন্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চেয়েছেন অর্জুনের মধ্যে দিব্য কর্মের প্রেরণা জাগ্রত হোক। দিব্য কর্ম হল সেই কর্ম যেখানে কর্ম হয়ে চলবে ভগবৎ দীপ্তি সর্বদাই নিবেদিত চরিত্রের। এমনই নিবেদিত যে কর্মরাজী হয়ে চলবে স্বার্থশূন্য, আকাঙ্ক্ষা শূন্য, অথবা কর্মটি একটি পূজা উপহার ভগবানকে। এই কর্মের মধ্য দিয়ে ভগবানকে বরণ করে নেওয়া হবে পূর্ণরূপে। কর্মটি যিনি করছেন তারই অধিকারে; কর্মের রীতি ও নিরীখ। জগৎ মাঝে ঐ কর্মের নির্দিষ্ট আবেদন আর কর্মের নিজস্ব পরিনতির অভীষ্ট পূরণ করেও আরও গতিময় প্রবাহে এগিয়ে যাওয়ায়ও অথচ এই কর্মের যা কিছু শুভময় পরিণাম হবে নিবেদিত দিব্য কর্মপথে।

সব কর্মাণি অপি কুর্বাণঃ সৎ ব্যাপাশ্রয়ঃ।
মৎ প্রসাদাৎ এব আপ্নতিঃ শাশ্বতং পদম অব্যয়ম।। (গীতা, ১৮/৫৬)

পরিণামটি জীবের বা জগতের জন্য নয়। পরিণামটি ভগবানের শাশ্বত সনাতনী প্রবাহ পথে মহাকালের কালসীমার স্পন্দনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া। কর্ম সম্পন্ন করবার এই পথে যদি ভগবানই হন আশ্রয়; তিনিই সূচনায় — তিনিই মধ্যে কর্মের প্রবাহ মার্গে আবার তিনিই প্রাণ শক্তির আশ্রয়ে জীবন প্রবাহকে দিব্য পথ মার্গে এগিয়ে নিয়ে চলবেন অনন্ত ঐ ভাবধারাকে জীবন মাঝে বরণ করে নিয়ে সদাজাগ্রত এক অনন্য আশ্রয় গড়ে নিয়ে কর্মের ভাবশরীরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হওয়ার মধ্যে। যিনি ভগবানকেই নিবেদন করে ভগবানের আশ্রয়েই ঐ কর্মই করবেন সম্পাদন তিনিই হয়ে উঠবেন কালজয়ী। নিত্য পথের দ্যোতনায় তিনিই হয়ে উঠবেন কালজয়ী। নিত্য পথের দ্যোতনায় তিনিই রচনা করবেন জীবনের শিবসমন্বয় কর্ম প্রবাহের মধ্য দিয়ে দিব্য কর্মপথে।

চেতসা সর্বকর্মানি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধি যোগম উপাশ্রিত্য মৎ চিত্তঃ সততং ভব।। (গীতা, ১৮/৫৭)

ভগবানকে আশ্রয় করে এই কর্ম সদাই ভগবৎ চেতনকে আহ্বান ও উদ্দীপন করে নিয়ে যায়। শাশ্বত সনাতনী মার্গে। এই শাশ্বত সনাতনী মার্গ সর্বদাই জীবনের নিত্য অন্বয়ে গড়ে দেবে কর্মের অবয়বে শিব স্পন্দন। নটরাজের কালের ছন্দটি সর্বদাই কেন্দ্র অভিমুখি হয়ে পরমের আশ্রয় অভিলাষী, অথচ জগৎ স্পন্দনের দৃঢ় পরিচয়টি বহির্মুখি; কালের মিলন নিবেদনে।

ঈশ্বরঃ সবভূতানাং হৃৎদেশে ইহ অর্জুনঃ তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন সর্বভূতানি যন্ত্র আরুঢ়ানি মায়য়া।। (গীতা, ১৮/৬১)

সকল জীবনের অভ্যন্তরে অন্তরের মহৎ বীজ হয়ে তিনি বিরাজমান রয়েছেন সর্বদাই। তিনি শাশ্বত সত্যকে জগতের জন্য দিয়েছেন সদা উপহার, তাই জীবন পথটি রয়েছে নিত্য অভীপ্সার জাগ্রত এক সমন্বয়ী সূত্র। যে চায় জীবন তারই কাছে হয়ে ওঠে অনন্ত ভাবের মিলন অভীপ্সু। ভগবানকে বরণ করে নিয়ে এগিয়ে চলতে যখন হবে শুরু জীবন কর্মের ক্রমে মায়ার জাল একটু একটু করে হয়ে উঠবে স্বতঃ উন্মোচিত। মায়ার দীপ্তি সরে গিয়ে জীবন পথকে তখন এক অনির্বচনীয় ভাবাবস্থার অঙ্গন থেকে সরিয়ে নিয়ে আসবে উপলব্ধির প্রত্যক্ষ সোপানে। জীবের অন্তরের আলোক প্রদীপ্ত শিখাময় হয়ে বুঝিয়ে দেবে এই বিশ্বমাঝে সেই বিশ্বপতি বিরাজ করছেন, হৃৎ কন্দরে। নাও ঐ বিশ্বপতির আশ্রয় জীবনে।

—ঃঃ—

সাধন প্রয়াস

অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভক্তি আর ভাগবতী সাধন যেন জলভাত। সাধারণভাবে সকলেই ভাবতে পারে নিজেকে ভক্তরূপে। একটি বিশ্বাস হয়তো বা হয়েছে; একটু জপধ্যান হয়তো বা হয়েছে; একটু আধটু মন্ত্র উচ্চারণ হয়তো বা কিছু কিছু কিছুদিন হয়েছে; অথবা পূজার উপকরণ দিয়ে ভগবানের কাছে কোন রূপ বা ভগবৎ মন্দির ঘরে। বাইরে সর্বত্র কোথাও কখনও হয়েছে তো মনের মধ্যে ভেসে ওঠে ভক্ত হয়ে ওঠার বোধ। কখনও বা সামান্য কোন কিছুর দান আর নিবেদন হয়েছে বিশ্বাস তবে গড়ে ওঠে; মনে হয় ভক্ত হয়ে ওঠা। জগতের মাঝে ভগবান স্বতঃই সর্বত্র সব কিছুতেই জুড়ে রেখেছেন। কিন্তু মানবের ভাগবতী সংযোগে সাধারণভাবে সবটাই অথবা এর বেশিরভাগটা বাহ্যত। সবটাই অথবা প্রায় সবটাই আংশিক। সাধন পথের যিনি পথিক বলে নিজেকে ভেবেছেন অথবা সত্যিকারের পূজা-জপ-ধ্যান-চিন্তন-মনন যিনি করবার জন্য ব্রত নিয়েছেন তাঁকে হতে হবে অত্যন্ত সতর্ক এবং পুরোপুরি নির্ভেজাল। হয়ে উঠতে সময় লাগবে এটা ঠিক। কিন্তু সাধন অর্জনের পথে সত্যি করে যদি এগিয়েছেন তবে প্রথমেই ছোট ছোট মায়ার দড়ি কাটিয়ে উঠবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। নতুবা পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ মানুষকে পশুর সঙ্গে সমান করেছেন আদতে সেই সমানিকরণই জীবন-যাপনের ইতিহস আর অবস্থান প্রমাণ করবে সত্যি বলেই।

As it is this disposition which forms that difference of talents, so remarkable among men of different professions, so it is this same disposition which renders that difference useful. Many tribes of animals, acknowledged to be all of the same species, derive from nature of much more remarkable distinction of genius, than what antecedent to custom and educations, appears to take place among men. By nature a philosopher is not in genius and disposition half so different from a street porter, as a mastiff is from a greyhound, or a greyhound from a spaniel, or this last from a shepherd's dog.... Each animal is stiil obliged to support and defend itself separately and independently and drives no sort of advantage from that variety of talents with which nature has distinguished is follows. Among mess, on the contrary, the most dissimilar geniuses are of use to one another; that different produces of their respective talents, by the genius disposition to truck, barter and exchange, being brought as it were, into a common stock, where every man may purchase whatever part of the produce of other men's talents be has occasion for.

(Adam Smith, Wealth of Nations, (1776), Finger Print Classics, 2023, Reprint, p. 75)

অ্যাডাম স্মিথ আধুনিক অর্থনীতির প্রকৃত জনক, The wealth of Nations-এ মানবের ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন মানুষ হল আদতে পশু। তফাৎ হল পশুর মধ্যে দরদাম বা Bargaining Power and capacity নেই, কিন্তু মানুষ ঐ দরদামের ভিত্তিতেই সমাজ রচনা করে; পরিবার-সমাজ-দেশ-বিশ্ব সর্বত্রই বাজারের রীাতি। দরদাম কখনও হয় বলে কইয়ে আবার কখনও বা নিঃশব্দে, অদৃশ্যে, অলক্ষে, অসাক্ষাতে। এই যখনই স্মিথ বলেছেন কুকুরদের মধ্যে নানা প্রজাতির পারস্পরিক তফাৎ অনেক যেমন, Mastiff, Greyhound, Spaniel, Shepherd এরা প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ প্রকৃতি বা ধরণের অধিকারী। মানুষের মধ্যে সাধারণ সাযুজ্য তার স্বার্থবোধের নিরীখেই সবকিছু করা। এই সাধারণ সাযূজ্যের যে বাতাবরণ তারই মধ্যে ভগবানকে খুঁজে নিতে হয় একটু ঠাঁই অবশ্য যদি থাকে মনের মাঝে দেওয়ার মত কোন ঠাঁই। বাইরের যা কিছু কথা অথবা ব্যবহার, যা কিছু প্রকাশ সেখানে হয়তো বা ভগবান শুধু উপস্থিত তাই নয়, যেন ভগবানেরই কথায়, আহ্বানে চলেছে সে জীবগুলি। যেন বিশেষভাবে মনের প্রাণের হৃদয়ের মাঝে ভগবান অবস্থান করেছেন আর জগতের সব কার্যাদি ঐ অবস্থানকেই বিশ্বাসে রূপান্তরিত করে গিয়েছে। যেন ভগবানই জীবনের চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছেন, ভগবানই যেন জীবনের রাজা।

ভ্রান্ত ভিত্তির উপর নির্ভর করে ঈশ্বরলাভ অসম্ভব। ভগবৎ পথে যদি কেউ এগিয়ে আসবার মন করেছেন, তার প্রথমেই সতর্ক হয়ে যান মায়ার ছলনামূলক অবস্থান থেকে। মায়ার জাল শুধু যে শক্তিশালী তাই নয় এটি প্রায় অমর, মায়ার জালের যুক্তি শক্তি সাধারণ ক্ষমতাশালী।

দিব্য বিজ্ঞানের বিস্তারে ঃ পুষাঃ তঃ এতঃ নয়তু হস্তগৃহ্য।
অশ্বিনা ত্বা প্র বহতাং রথেন।
গৃহান গচ্ছ গৃহপত্নৌ যথাসৌ।
বশিনী ত্বং বিদথমা বদামি।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/২৬)
দিব্য বিজ্ঞানের পাঠ পেয়েছি এখন উপলব্ধির পথে।
এই প্রবাহ মাঝে হয়েছে তোমারই নিত্য বিকাশ স্পন্দন।
যে ভাব সম্পদ এসেছে জীবনে এই পথচলার মাঝে।
হয়েছে তারই বিপুল বিকাশ জীবনের এই প্রবাহ পথে।
এখন হোক তোমারই এই দিব্য প্রকাশ জীবনের মুক্ত পথে।
যে প্রজ্ঞার বার্তা পেয়েছে জীবন প্রকাশের পর্বে পর্বে।
এখন হয়েছে ঐ বিপুল বার্তার প্রকাশ পর্বের নিবেদনে।
ভগবৎ ভাব বিকাশ এখন জীবনের জন্য হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে।।

পার্থিব মায়ার বন্ধন ঃ ইহ প্রিয়ং প্রজয়াতে সমৃধ্যতাম্।
অস্মিন গৃহে গার্হপত্যায় জাগৃহি।
এনা পত্যা তন্বং সং সৃজস্ব।
অধা জিব্রো বিদথমা বদার্থঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/২৭)
জাগতিক সম্পর্কের জাল হয়েছে বিস্তৃত সদাই।
এখনই হবে নবীন জাগরণের সূত্র সবার মাঝে সঞ্চার।
যে বিকাশ হয়েছে নানা সম্পর্কের ছড়িয়ে যাবার পথে।
হয়েছে তারই বিশেষ উন্মোচন এই বিকাশের পর্বে।
এই প্রকাশ ক্ষণের বিপুল দীপ্তির সংযোগ এখন প্রভাময়।
হবে জীবনের এগিয়ে চলার পর্বে উত্থানের এই আহ্বানে।
অন্তর প্রদেশের একাত্ম হয়ে থাকবার অঙ্গাদির যোজনায়।
হয়েছে তোমারই প্রকাশ এখনই জীবনের পর্বে পর্বে।।

বাসনার গণ্ডী পেরিয়ে ঃ নীল লোহিতং ভবতি কৃত্য।
আসক্তি বি অজ্যতে এধন্তে।
অস্যাঃ জ্ঞাতয়ঃ পতিবন্ধেষু বধ্যতে।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/২৮)
জগতের মাঝে হয়েছে নানা বর্ণের সমাহার।
যখনই হয়েছে জীবনের এই আত্মপ্রকাশ পর্বের মাধুর্য।
পার্থিব পরিচয়ের সব মিলনে হয়েছে আবৃত দৃঢ় প্রত্যয়।
পার্থিব বিষয় বাসনার আসক্তির হোক বিনাশ স্বতঃই।
এখনই হোক জীবনের এই পর্বে মোহ মুক্তির সাধন।
জগৎ বিজয়ের এই পর্বের হয়েছে নিত্য উন্মোচন সত্যের।
যে ভাবপ্রকাশ হয়েছে জীবনের নিত্য প্রকাশ
তারই এখন বিপুল প্রকাশ জীবন প্রবাহের এই পর্যায়ে।
তারই এখন বিপুল প্রকাশ জীবন প্রবাহের এই পর্যায়ে।

দৈবীভাব পরিগ্রহের পথে ঃ পরাং দেহি শামুল্যাং ব্রহ্মভ্যৌঃ।
বিভজা বসু কৃত্যেযা পদ্বতী ভূত্বো।

আ জায়া বিশাতে পতিম্।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/২৯)
এই বিকাশ পথের আলোক এখন হোক মুক্ত
যা কিছু ছিল জীবনের অবস্থার মাঝে হয়ে উন্মোচন।
হয়েছে তারই নিত্য বিকাশ অবস্থার মাঝে অবস্থান।
দেবতার এই বিকাশ পর্ব হোক মুক্ত বিপুল প্রকাশ পর্বে।
সাধন প্রজ্ঞার জাগরণ পর্বে এসেছে নিত্য মুক্তির আবহে।
এখন স্বতঃ হোক দেব বিকাশের নিত্য সংবেদ প্রস্তুত।
যে বিকাশ পর্ব হয়েছে জীবনের জন্য স্বতঃ প্রভাময়।
হয়েছে সে বিকাশের মূর্ত প্রবাহ তোমারই ভাব গ্রহণে।।

ভগবানের পথে আসবার ঘোষণা জীবের যেন একটা মানসিক তৃপ্তি ও সন্দেশ। 'আমি ভগবানে বিশ্বাস করি'— এমন বক্তব্যকে সতীকরে বাস্তবে পরিণত করা প্রকৃতভাবে অত্যন্ত কঠিন। বিষয়টি আবার খুব সহজ। ভগবান স্বয়ং হলেন নির্বিকার। লক্ষ কোটি মানুষের মধ্যে একজনও যদি সত্যিকার ভগবানের পথে এগিয়ে আসে তবে বুঝতে হবে অনেক হয়েছে। প্রতিটি মানুষেরই একটা জীবন বোধ বা জীবন প্রজ্ঞা থাকতে পারে। একজনের বিশ্বাস তার জীবনকে ধরে রাখে। একজন যুবক বিমান বন্দরের যাত্রী পরিষেবার কাজে নিযুক্ত। তিনি খুব হাঁসি খুশি। বললেন সবসময় সে এমন হাঁশি খুশি থাকতে ভালবাসে। সমস্যা অনেক তার মধ্যেও সে এমন হাঁসি খুশি। বলেন তার পরিবারের মানুষজন খুব ভাল। কাজের জায়গায় সবাই ভাল, এই সবকিছু ভাল ও খুশির বিষয়ের মধ্যে কারো প্রতি কোনও অভিযোগ নেই; শুধুমাত্র একজনের বিরুদ্ধে ঐ হাঁসি খুশির জীবনে এগিয়ে চলা যুবকের অভিযোগ — সে হল ভগবান। 'ভগবানই আমার এই দশা করিয়েছে; হুয়িল চেয়ার ঠেলে চালাতে হচ্ছে। এমন অভিযোগ। ভগবানই যত নষ্টের গোড়া — এরকমই মনের ভাব তার। সে জীবনকে যুদ্ধ বলে মেনে নিয়েছে। যুদ্ধ একাই করেছে। 'ভগবান যদি একটা বড় পরিবারে নিয়ে আসত — তবে জীবনে অনেক সুখ হত' — বিশ্বমাঝে এমন করে ভগবানকে দায়ি করে রাখা— এটি তো এতটাই বেশি সংখ্যায় যে অনন্তই বলা যায়।

People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices. It is impossible indeed, to prevent such meetings, by and law which either could be executed, or would be consistent with liberty and justice. But though the law can not hinder people of the same trade from sometimes assembling together, it ought to do nothing to facilitate such assemblies, much less to render them necessary.

An incorporation not only renders them necessary, but make the act of the majority binding upon the whole. In a free trade, an effectual combinations cannot be established but by the unanimous consent of every single trade and it cannot last longer man every single trader and it cannot last longer than every single trader continues of the some mind. The majority of a corporation can enact a says law, write proper penalties, which will limit the competition more effectually and more durably than any voluntary combination whatever.

(Adam Smith, The Wealth of Nations, 1776, Finger Print Classics Reprint 2023, p. l93)

অর্থনীতির রূপরেখা গড়তে গিয়ে স্মিথ মানুষের মধ্যে বিভাগ করেছেন তাদের সব কাজের নীরিখে। যে যেমন কাজের মধ্যে রয়েছে তার এসেছে তেমন করে বেড়ে ওঠার পটভূমি। নিজের কর্ম অভিজ্ঞতা নিজ জীবনের পরবর্তী পরিকাঠামো গড়ে দিতে পারে। একজন ব্যক্তির জীবনে তার চারপাশের যারা রয়েছে বিস্তৃত হতে পারে তাদের সামগ্রিক পটভূমি। একটা নির্দ্দিষ্ট কাজের ধারা ঐ ব্যক্তিকে করে ফেলে ঐ কাজের পরিচয়ের গড়নে গড়ে দিতে পারে। জীবনের সামগ্রিক পরিচয়টি এখন গড়ে তুলতে হলে ভগবানকে বরণ করতে হবে। এজন্য নিজের উচিৎ কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়কে মন রাখা ঃ

১) ভগবানকে পেতে হলে ঠিক ঠিক ভাবে — তবে ভগবানকে সত্যিকরে আপন করতে হয়। (ভগবানই সত্য সত্য আপনার আপন—জাগতিক সম্পর্কের ধাঁজে ভগবানকে বাঁধা যায় না)।

২) জাগতিক কর্তব্য, সম্পর্ক, দায়িত্ব, প্রয়োজন, সমস্যা, উদ্দেশ্য নিয়মাদি, চাওয়া পাওয়ার হিসেব, হয়ে আকাঙ্ক্ষা, তৃপ্তির নেশা, অহং এর তৃপ্তি এসবই আপাত দৃষ্টিতে সত্য এবং ভালো; কিন্তু আদতে সবই বিভিন্ন মাত্রার বিষ — কোনগুলি ভীষণ বিষাক্ত আবার অন্যটি হয়ত কম (কোনগুলি কোবরার বিষ আ কিছু হয়ত বিছের)।

৩) নিজের ক্ষমতা যোগ্যতা নিজস্বতার ভিত্তিতে সবই হয়েছে বা হচ্ছে এই বোধকে জলে ফেলে দাও — যা কিছু ভাল সবই ভগবানেরই কৃপার ফসল আর যদি কিছু এমন হয়েছে যা খারাপ বলে মনে হচ্ছে— এসবই নিজস্ব কৃত কোন না কোন কর্ম বা চিন্তার ফল।

৪) শিব সাধন হল শিব তন্ময় অন্তর চেতন। ভগবান সদাই নিজ অন্তহীন বিকাশের প্রতি হয়ে রয়েছেন একেবারে পূর্ণ নিমজ্জিত মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব নয় মানুষকে হতে হবে অনুরাগী — অনুরাগী সেই যে ভগবানের ইচ্ছাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে পারে বরণ করতে অন্য সব যুক্তিকে ফেলে দিয়ে।

৫) ভগবানকে নিজ জীবনে অনুভব কর। তিনিই হৃদয়ের অভ্যন্তরে হৃদয়রাজ। তিনি তন্ত্রীতে কোষে সর্বত্র রয়েছেন—তাঁর স্পর্শ জীবনের বড় বাস্তব বড় সত্য। তিনিই হলেন পরিপূর্ণ বরণীয়।

প্রকৃতির পথচলার মধ্যে রয়েছে পঞ্চ মহাভূতের সংযোগ অথবা প্রভাব। ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ ব্যোম—এই পঞ্চ মহাভূতের মিলনের প্রকরণের উপরই গড়ে ওঠে প্রকৃতির কালযাত্রা। মহাকালের এই কালচক্রে প্রকৃতি বিরাজ করে রয়েছেন নিরপেক্ষ - অথচ সৃষ্টিশীল মহতি রূপে। প্রকৃতি জীবনকে গড়ে তোলেন; আবার ধারণও করেন। জীবনের বীজশক্তি আসে মহাকালের কাল ছন্দে। মহাকালের এই কালছন্দ জীবনের ব্যাপ্ত-বিস্তৃত এই প্রবহমানতা প্রবৃত্তির বুকে যেমনে নতুন নতুন ছন্দ সৃজন করে চলেছেন তেমনি আবার এ একটি বিষয়ের উপর গভীর প্রচার বিস্তারের দ্বারা ঐ বিষয়কে দৃপ্তপ্রভাব বলয়ের মধ্যে আরও যেন গ্রথিত হয়ে চলেছে। প্রকৃতির বিস্তারটি সার্বিক হয়ে ওঠে। প্রকৃতির জন্য লালন, তিনি স্বয়ংই এই মাতৃপরশটি ছড়িয়ে দিয়েছেন মাটিতে-জলে-বায়ুতে-অনন্তরিক্ষে ও মহাকাশের ঐ মহাশূন্যে। তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত এক বিরাট-অনন্ত প্রভায় জ্যোতির্ময় মহামাতৃকা হয়ে স্বতঃই বিরাজ করে আছেন। মহাকালের কালস্পন্দনে সৃষ্টির যে অনন্ত আস্পৃহা সেটি এখন হয়ে চলেছে জীবনের নবীন উন্মেষ ক্ষেত্র। ধরিত্রীর মাতৃ স্পন্দন তাই সৃষ্টির সূচনাতেই যেমন সৃষ্টির পথ প্রসারী। ধরিত্রী মাতা সব বীজই ধারণ করে নেন। ধরিত্রীর এগিয়ে চলার ছন্দ প্রস্তুত হয়ে রয়েছে বিশ্বমাঝে দেওয়া মহাসৃষ্টির স্পন্দন। যার মধ্যে নিহিত হয়ে রয়েছে ঐ পরম প্রকাশ। ধরিত্রী মাতা এমন সহস্র কোটি প্রাপ্ত জীবন বীজকে চেতনা সম্পৃক্ত করে জীবন গড়েছেন।

Working on the black Sea had a profound influence on how I think about the evolution of life on Earth. In my mind, sampling deeper into the water column was like going back in time to find microbes that had once dominated the oceans and are now confined to a very small fraction of their former habitat. The protosynthetic green sulphur backteria, which turned out to be the organisms responsible for the strange fluorescence signal, are obligate anacrobes; they use energy from the sun to split Hydrogen sulphide and use hydrogen to make organic matter. These organisms can live at very low light intensities but can not tolerate exposure to even small amounts of oxygen.

Animals cannot live for long without oxygen, and there appeared to be none in deeper waters. Microbes had altered the environment of the Black Sea. They produced oxygen in the upper hundred meters but consumed the gas further down. In so doing, they made the interior of the Black Sea their exclusive home.

(Paul G. Falkowski, Life's Engines, How microbes made earth habitable, Princeton University Press, Princeton, 2015, p. 9.)

সৃষ্টির পিছনে বিরাজ করছে স্রষ্টার ইচ্ছা। ভগবানই সৃষ্টির দ্যোতনা এনেছেন। একের পর এক সৃষ্টির পর্ব এসেছে। কোন্‌টি প্রথমে, কোনটি পরে — এর সম্পর্কে ডারউইন থেকে শুরু করে বহু জন ইভল্যুশনের তত্ত্ব দিয়েছেন। ডারউইনের অরিজিন অব স্পেসিস একটি সামান্য পর্যবেক্ষণমূলক পরীক্ষা দ্বারা অনুমানের উপরই দাঁড় করিয়েছেন সিদ্ধান্তগুলি। ছোট্ট দ্বীপের মাঝে ক্ষুদ্র

প্রাণের বেড়ে ওঠা আর ধ্বংস হওয়ার মধ্য দিয়ে প্রজাতির পরম্পরা ও চরিত্র নির্ধারণ করেছেন। পরম্পরা ও চরিত্র নিরুপনের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে এক একটি প্রজাতির জীবন গড়ে উঠেছে। এরই মধ্য দিয়ে অনুমানগুলি প্রমাণ ও পরিনীতিতে এক ধরনের বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। বেদবিহিত প্রজ্ঞার নিরীখে এই বিশ্বাসটি বহু সহস্র বৎসরে লালিত হয়েছে যে সমগ্র সৃষ্টিই ভগবানের দান। তিনি পঞ্চ মহাভূত রচনা করে প্রকৃতির মাঝে জীবন সৃষ্টি ধারণও লালনের পটভূমি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির আদি রচনার বীজ মহাকাল স্বয়ংই দান করেছেন প্রকৃতির পটভূমিতে। এরই ধারাবাহিকতা গড়ে উঠেছে অন্ন-প্রাণের সম্মিলনে। অন্নময় কোষ ব্রহ্ম বাচক। ঋষির উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে এই সত্য। ভাগবতী সত্যকে ঋষি ভগবানের ভাষাতেই বর্ণনা করেছেন এটি বলে অহম্ অন্নম্। তিনি স্বয়ংই অন্নময় হয়েছেন প্রাণের সঞ্জীবন ও বিকাশের জন্য। প্রতিটি প্রাণেরই অস্তিত্ব গড়ে উঠেছে ঐ প্রাণের উপযুক্ত অন্নের উপর নির্ভর করে। একটি প্রাণের জন্য যেটি অন্ন সেটি আবার অন্য প্রাণের সৃজন ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে। অন্নময় কোষই পরিণামে প্রাণময় হয়ে ওঠে কতকগুলি পরিস্থিতির সোপান পেরিয়ে। সময়ের তীরে এসে অন্নময় কোষ প্রাণশক্তি সঞ্চারী প্রাণময় হয়ে ওঠে পঞ্চ বায়ুর মিলন সঞ্চালনে। সপ্তধাতুর সামগ্রিক ক্রিয়া আবার এক একটি প্রান্তিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হয়ে ওঠে বিশেষ চেতন শক্তি সঞ্চারী বিজ্ঞানময় কোষের সমন্বয়। মনোময় কোষ যখন হয়ে ওঠে নিরেট-বিশুদ্ধ, ভগবৎমুখি, তবে প্রাণময়ের আহূত প্রাণশক্তি নিয়োজিত হয়ে যায় ব্রহ্মপথের সত্য আহরণে। বিশ্বাসে-ভক্তিতে-ভালবাসায় ভরপুর হয়ে যাওয়া এই জীবন ব্রহ্মচেতনঘন হয়ে ওঠে।

মানবের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি হল জগতিক বিষয়কে অনুধাবন করে জাগতিক দৃষ্টিতে যেসব চাওয়া-পাওয়ার প্রসঙ্গ রয়েছে সেসব নিয়ে ব্যাপৃত থাকা। জাগতিক বিষয়গুলির মধ্যে চাওয়া-পাওয়ার সংবেদগুলির একদিকে রয়েছে মানবের প্রয়োজনের বিষয়গুলি, আর অন্যদিকে রয়েছে লোভ চরিতার্থ করবার বিষয়াদি। প্রয়োজন ও লোভ দু'টি প্রান্তের হলেও বহুসময়ে এমনই পরিস্থিতির সূচনা হয় যে কোনটি প্রয়োজনের বস্তু আর কোনটি লোভ চরিতার্থ করবার — এ বিভাজন মুছে যায়। জীবনের জন্য প্রয়োজন বিষয়ে বোধ ও সিদ্ধান্ত পরিবর্তনশীল সময়ের সঙ্গে, পরিস্থিতির সঙেগ এর পরিবর্তন হতে থাকে। একই ব্যক্তি নানা সময়ে, তার দৃষ্টিভঙ্গির নানারূপ বদল ঘটান। প্রকৃতভাবে তার মনে হতে থাকে ইতিপূর্বে এমন অনেক কিছু বিষয়ে তার ধারণা ছিল যে ঐ সবগুলির সাধারণ প্রয়োজন নেই — ওগুলি লোভের সমগ্রী। কিন্তু পরিবর্তিত মনের অবস্থায় তার নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐগুলির সাধারণও ও স্বাভাবিক প্রয়োজন ফুটে ওঠে। এমন করেই চলে বাসনার অভিযান। অন্তরে দৃষ্টি দিয়ে মানবের এই বোধ ও প্রত্যয় কখনও থেকে যায়, আবার কখনও ঐ বোধ ও প্রত্যয় বিগলিত হয়ে যায়। সাধারণভাবে ভোগী মানুষও হতে পারে উপলব্ধিবান।

Examination of cells with the electron microscope quickly confirms the existence of nuclei, the Golgi apparatus, mitochondria and chloroplasts in cukaryotic cells. But surprisingly, it also revealed that these structures were absent in many microbes, There appeared to be a finite number of matryoshka dolls in microbes. The organisms that locked these internal, membrane bound structures were collectively lumped into a group called prokaryotes. However, details about the architecture of the interiors of all cells revealed some common structures, regardless of whether the cell had a nucleus or not. All required certain parts.

One of these all inclusive parts is the ribosome. These look like very small, fuzzy balls that appeared to both float freely in the liquid inside cells and line up along specific internal membranes. George Palade discovered that the small balls contained both protein and a nucleic acid. The nucleic acid in the nucleus is DNA, whereas that in the ribosome contained ribonucleic acid. Ribosomes are microscoipic machines that take information from a DNA sequence via messenger molecule.

(Paul G. Falkowski, Life's Engines, How Microbes Made Earth Habitable, Princeton University Press, Princeton, 2015, p. 51.)

জীবন ধারণের জন্য ভোগের বাস্তবিক প্রয়োজন রয়েছে। বৈদিক সভ্যতার ঋষিগণ এই সিদ্ধান্তে সকলে একমত হলেন যে মানবের পক্ষে এক সাযুজ্যপূর্ণ জীবন গড়ে তোলার জন্য চারটি বিভিন্ন বিভাগ প্রয়োজন। এই চারটি বিভাগকে এক সূত্রেই বেঁধে দিয়েছেন ঋষিগণ। এরা হল ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ। ধর্মই হতে হবে জীবনের ভিত্তি। ঋষিগণ যখন ছাত্র শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছেন,

এই শিক্ষার মধ্যে অনেকগুলি বিভাগ ছিল। শিক্ষার প্রথম অঙ্গ হল চেতনার জাগরণ, মনের মালিন্য দূর করে বিশুদ্ধ মনের অধিকারী হওয়া, বিশুদ্ধ চরিত্র গঠন। জগতের প্রতি সহনশীল ও জগতের সব বস্তু প্রাণাদির জন্য মনের প্রস্তুতি গড়ে তোলা। শুধুমাত্র নিজের স্বার্থ অথবা নিজ জনদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে তৎপর না হয়ে জগতের বহু মানবের হিতসাধনও বহু মানবের কল্যাণ কর্মে ব্রতী হওয়া। বহু মানবের জন্য সুখ সাধনে চিন্তাও বহু মানবের জন্য কল্যাণ চিন্তার জন্য চাই এক অনন্য উদার মন। লোভ-মোহ-কাম- হিংসা-বিদ্বেষ-ক্রোধ-বাসনাদি-ঈর্ষা ইত্যাদির কবলে মন সাধারণত হয়ে থাকে ভারাক্রান্ত। এসবগুলি হল মনের মালিন্য। মনের মালিন্য যতই থাকবে ততই মানুষটি হয়ে যাবে ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্রত্ব গ্রাস করবে ঐ মানুষকে। ক্ষুদ্রত্বের বন্ধনে বন্দী মানুষের মধ্যে বিরাজ করে আত্মমুক্তি প্রবণতা। জগতের যা কিছু ভাল বলে মনে হয়; যা কিছু সুন্দর বলে মনে হয়, যতই নিজের দিকে আকর্ষণ করে নিয়ে আসতে মনের মধ্যে বাসনা জেগে ওঠে। যে শক্তিমান সে ঐ শক্তির অপব্যবহার করে চূড়ান্ত ভোগের অভিমুখে টেনে নিয়ে যায় নিজের জীবনকে। এমন করে নিজের শক্তি ও সামর্থকে নিজের ভোগের সোপান হিসাবে ব্যবহারের ও তার প্রচেষ্টার ফলে গড়ে ওঠে সমাজের ফাটল। ফাটল এমন মাত্রা ও পরিসর নিয়ে নেয় যেন অপরিবর্তনীয় ও অপূরণীয়। মনের মালিন্য দূর হতে পারে ক্রম প্রয়াসে। এই ক্রম প্রয়াসটি কখনও জীবনের নিত্য ছন্দকে বরণ করে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে সাধন প্রস্তুতিও পদ্ধতির দ্বারা, আবার কখনও ভগবানে নিবেদিত শুদ্ধ মনের ভক্তির টানে এই সাধন পর্ব সুনিশ্চিত এক পটভূমির রচনা করে দেয় যার ফলে ক্রম বিকাশে আসে মনের বিশুদ্ধি।

মুক্তির পথে ঃ অশ্রুরা তনুঃ দ্রবতি রুপতী।
পাপ্যাম ইয়া পতিঃ যৎ বধ্নৌ বাসনা।
স্বমঙগম্ অতিধিতঃ মতেঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/৩০)

বিশ্বমাঝে হয়েছে যে ব্যাপ্ত চেতন প্রকাশ জীবনে।
এসেছে সময় করতে তারই উন্মোচন স্বতঃ বিকাশে।
এই জীবন পথ হয়েছে পূর্ণ ঐ চেতন বিকাশের ধারায়।
তোমারই এই স্বতঃ প্রকাশী জগৎ বৃত্তে হয়েছে কালের পথ যাত্রা।
যা কিছু হয়েছে কর্মের প্রদীপ জীবন পথে এখন এই ক্ষণে।
হোক তারই নিত্য বিকাশী সব সম্ভাবনার ক্ষণ উন্মোচন।
নিত্য চেতনের এই জীবন স্পর্শ দিয়েছে সম্ভাবনার বিকাশ।
যে ভাবধারায় হয়েছে স্নাত এই ক্ষণকালের জীবন প্রকাশে।

বিকাশের এই পর্বে ঃ যে বধ্বচন্দ্রং চ ব হতুং।
যদমা যন্তি জনাদনু।
পুনঃ তান যজ্ঞিয়া দেবা জয়ন্তু। যৎ আগতাঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/৩১)

এই ধরিত্রীর পৃষ্ঠপরে এসেছে সব বৈচিত্রের দান।
তোমারই দেওয়া এই জগৎ পরম্পরায় হয়েছে প্রবাহ।
যা কিছু সৃষ্টির দ্যোতনা হয়েছে তারই রচনা এখন।
যদি বা এসেছে জীবনের মাঝে জড় প্রবাহ স্বতঃই।
এখন হয়েছে যতই ঘটনার বৈচিত্র জীবনের ধারণে সাধনে।
এসেছে নিত্য প্রবাহ ঐ অন্তরের শুভ দীপ্তির জাগরণে।
যে ভাব বিকাশ হয়েছে এখন জীবন পথের মাঝে।
আসুক জীবনের নবীন জাগরণে সে জীবনের ভাব বিকাশ।।

শুভ্র চেতনের শুভ্র আবহে ঃ মা বিদন্ পরি পন্থিনো যে আশাদন্তী দংপতী।
সুগেভিঃ দুর্গম অতিনাম। অপ দ্রন্ত অব রাতয়ঃ।

সুমঙ্গলং অরিয়ং বধুঃ ইমাং সমেত পশ্যতঃ।
সৌভাগ্যম অস্তৈ দন্তায়া এব অথার্স্তং বি পরেতন।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/৩২-৩৩)
জগতের সব মালিন্যের ক্ষণপ্রভা হয়েছে যদি শুভ চেতন জাগ্রত।
হয়েছে যদি চেতনার সঞ্চার জীবনের পর্বেপর্বে তোমায় নিবেদনে।
এখন হোক নিত্য বিকাশের এই পথমাঝে তোমারই জগৎ যাত্রা।
যে ভাবপ্রদীপ এই বিকাশ পর্ব করেছে উন্মোচন জীবন মাঝে।
হোক তারই মুক্ত প্রভা জগৎ মাঝে সদা আবর্তনের এই দৈবী প্রভায়।
তোমারই ভাববিকাশ হয়েছে যে ভাবমাত্রায় এখন তারই প্রকাশ।
দাও ঐ ভাবপ্রবাহের মাঝে তোমারই স্পর্শের চেতন দীপ্তি।
জগতের এই জীবনের মাঝে হয়েছে নিত্য বিকাশ এই পথ প্রবাহে।।

ব্রহ্মজ্যোতির এই প্রবাহ ক্ষণে ঃ তুষ্টম্ এতৎ। অপাষ্টব দ্বিষবন্ নেতদ্ অন্তরে।
সূর্যা যো ব্রহ্মা বিদ্যাৎ। সঃ ইৎ বাধুয়ঃ অর্হতিঃ।
আশাসনং বিশসনম্। অযৈ অবি বিবর্তনম্।
সূর্যায়া পশ্য রূপানি। তানি ব্রহ্মা তুশৃন্বতিঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/৩৪-৩৫)
জগতের মাঝে হয়েছে উদয় এই জগৎ সূর্য।
যা কিছু হয়েছে জগৎ মাঝে বিপর্যয়ের পূর্ণ প্রকাশ।
এই বিকাশ পর্বের এখন হয়েছে ক্ষণ দেবতার জগৎ কল্যাণ ব্রতে।
হয়েছে বিকাশের পথে নিত্য উদয় তোমারই পরম প্রভা জগতে।
দেবতার এই শুভ্র চেতনের যজ্ঞপথে হয়েছে যে ব্রত সাধনে।
এখনই এসেছে ক্ষণ তোমারই নিত্য বিবেক পথের স্বতঃ বিকাশে।
এসেছে এখন ক্ষণ প্রভা যদি তোমারই জীবন ব্রতে হয়েছে মূর্ত।
এখন নিত্য বিকাশের এই পর্বে হোক তোমারই উন্মেষে স্বতঃই।।

মুক্তির হদিশ ঃ উক্তি হল বন্ধনের মৃত্যু। বন্ধন বহু ধরনের। বাইরের বন্ধন অদৃশ্যে মনের প্রাণের হৃদয়ের মধ্যে বাসা বাঁধে। বাইরের সমস্যাগুলির মধ্যে থেকেও ভগবৎ পথে অটুট থাকা যায় মনের দৃঢ়তায়। এখানে মূল বাধা হল ঃ ভয়-লোভ-আকর্ষণ-বাসনা-দায়িত্বের বোধ-কর্তব্য-অধিকার অর্জন-না পাওয়ার বেদনা-হেরে যাওয়ার জ্বালা-প্রতিশোধের স্পৃহা, অন্যের সঙ্গে তুলনায় ভাবা-আর আহমিকা-সবারই বিষয়ে মানুষের দৃষ্টি-মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন। মায়া হল অদৃশ্য এক ভাইরাস। এ লেগেই থাকে। মায়ার কবল থেকে বেরিয়ে আসার পথে প্রধান সমস্যা হল একে চেনা যায়। মায়ার বলে মিথ্যাকেই সত্য বলে মনে হয়। মায়ার দৃষ্টিতেই জগতের সব সম্পর্ক বিন্যাস। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন। বড়লোকের বাড়ীর গৃহকর্মী। ভদ্রমহিলা হয়তবা বাচ্চার দায়িত্ব পালন করছেন। বড় বাড়ীর কর্মী ওই বাড়ীর বাচ্চার দেখভাল করবার আয়ার কাজে বাচ্চাকে নিজের মত করে ভালবাসা আর আদর করেই নিবিড়ভাবে দায়িত্ব পালন করেন কিন্তু নিজের মনটি পড়ে রয়েছে ঐ নিজের বাড়ীতে রেখে আসা নিজেরই বাচ্চার দিকে। বড়বাড়ীর বাচ্চাটি বাহ্য পরিচয়ের আর নিজের বাচ্চার দিকে মনের গূঢ় গভীর স্পন্দন যেন সবসময়ই ছন্দায়িত হয়ে চলেছে। জীবনে ভগবানকে এমনই আত্যন্তিক করে নেওয়া যায়, নিতে হয়। মায়ায় বদ্ধ হতে নেই।

In that rude state of society, in which there is no division of labour, in which exchanges are seldom made, and in which every man provides every thing for himself, it is not necessary that any stock should be accumulated, or stored up before hand in order to carry on the business of the society. Every man endeavours to supply, by his own industry, his own occasional wants, as they occur, When he is hungry, he goes to the forest to hunt. When his coat is worn out, he clothes himself with the skin of the first large animal he kills; and when his hut begins to go to ruin, he repairs it, as well as he can, with the trees and the trust that are nearest it.

But when the divisions of labour has once been thoroughly introduced the produce of man's own labour can supply but a very small part of his occasional wants. The far greater part of them are supplied by the produced of other man's labour, which he purchases with the produce with the price.

(Adam Smith, The Wealth of Nations, 1776, Finger Print Classics Reprint 2023, p. 337)

স্মিথ পশু সমাজের পর্যালোচনায় বলেছেন, পশুদের মধ্যে কর্মবিভাগ বা ডিভিসন অব লেবার বলতে বুঝিয়েছেন কোনও একটি বিশেষ কাজকে সবচেয়ে ভাল করে তৈরী করা যায় যার ফলে ঐ কাজের জন্য সবচেয়ে ভাল বস্তুকেই গড়ে ফেলা যায়। জীবনের পরিচয় গড়ে ওঠে ঐ কাজের অংশ বা ধারা অবলম্বন করে। অর্থ ব্যবস্থা গড়তে হলে চাই প্রায় ঐ অর্থ ব্যবস্থার অবজেক্টিভটি পরিষ্কার করে জেনে বুঝে নেওয়া। অর্থ ব্যবস্থার পরিণত ও সামগ্রিক রূপ আর সব বিষয়েই গড়ে তুলতে পারবেন যদি সব মিলে একটা সামগ্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। যখন অংশই ক্রমে এক মুক্ত ব্যবস্থার দিকে নিয়ে যায়। স্মিথের মতে অন্যকে দিয়ে কাজ করে নিয়ে তার দ্বারা যে টাকা ও সম্পদ আয় হয়েছে সেদিকে নজর দিয়ে গড়ে তোলা। ধারণা যে সম্পদ ও প্রাচুর্য সবই জগতের কাছ থেকে এসেছ। এটা সত্য যে সব সম্পদ এই জগতের মাঝে এই সম্পদের উন্মোচন ও ব্যাপক বৃদ্ধি হতে পারে যখন কর্মের জগতে বিভিন্ন ধরনের কর্মের উদ্যোগের পরিণতিতে আরও বেশি করে সম্পদ গড়ে উঠতে পারে।

ভগবানের পথ যিনি নিজের অবস্থানকে অঙ্গীকার করেছেন তার পক্ষে কোনভাবে অর্থ-সম্পদের জন্য লোভাতুর হলে চলবে না। জগতে জীবন যাপন ও জীবনের ব্যাপ্তির জন্য সর্বদা হতে পারে যে মানুষটি নিজের কাজের উদ্দেশ্য হিসেবে গড়ে তুলেছেন নিজের একটি অবস্থান যেখানে কাজের জন্য পূর্ণ সততা পালন করা তারই কর্তব্য। কিন্তু ঐ কাজের মধ্যে থেকেই গড়ে উঠবে অন্য অনেকের কাজের সূত্র ও উপায়। একটা উদ্যোগ ক্রমে বহু উদ্যোগের সৃষ্টি করতে পারে। একটা উদ্যোগ ক্রমে আরও গভীর হয়ে উঠে জগতের জন্য বহুবিধ মঙ্গলজনক পরিস্থিতি করতে পারে। কর্মের ব্যাপক বিস্তার মানবের সমাজে জীবনের জন্য নিয়ে আসে সুখকর অবস্থান, হয় উন্নয়ন।

দিব্য কৃপার সদা বিকাশে ঃ গৃতনাভি তে সৌভগ অত্যায়ঃ হস্তং।
নয়া পত্যা জরদষ্টি অর্যথাসঃ।
ভগো অর্হমা সবিতা পুরংধিঃ।
মহ্যাৎ তু এব গার্হপর্ত্যায় দেবাঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/৩৬)
তোমার দিব্য কৃপার হস্ত করেছে প্রসারিত ঐ ভাবরাজি।
যা কিছু হতে পারে জগতের মাঝে দিব্য রূপান্তরের দিশা।
হোক এখন তোমারই কৃপার স্পর্শে তারই উত্তরণ নিত্য ভাবে।
এখন জীবন মাঝে হয়েছে যে ভাবপরশ নিত্য প্রসারে স্থিত।
হোক তারই নীরব ভাবপ্রকাশ দেবকৃপার এই পর্বের বিকাশে।
যে ভাববিকাশ হয়েছ আগত জগৎ মাঝে অরূপের পথে।
হয়েছে তারই বিস্তৃত নানা দেবরূপের এই জগৎ পথের বিকাশে।
তোমারই কৃপায় হয়েছে জীবন ভরপুর তোমার শক্তির এই পথে।

বিশ্বমাতার কল্যাণ রূপে ঃ তাং পুষঃ আশ্রিবৎ মাম আরে অন্ব চ।
যস্যাং বীজং মনুষ্যাং বপন্তি।
যাঃ ন উরুঃ উশতী বিশ্রয়াতে।
যষ্যাম অশন্তঃ প্রহরাম শেপম্।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/৩৭)
এই সরব বিশ্বের নীরব আবেদন এসেছে তোমার কাছে।
সৃষ্টির সর্বত্র হোক বিস্তৃত তোমারই কৃপার পরশ।
তোমারই কল্যাণ রূপের এখন জগৎ বিস্তৃত দেবভাবের বিকাশে।
যে পথে এসেছে জীবনের ভাব প্রাচুর্য হোক তার বিস্তৃতি।
এই বিশ্বমাঝে হয়েছে মূর্ত সেবাব্রতের প্রসারে স্বতঃই।

যে হয়েছে দেবপথে নিত্য বিকাশের প্রয়াসী এসেছে ক্ষণ তারই।
দেবতা তোমার এই বিশ্ব মাতৃকা রূপের হয়েছে সদা প্রকাশ।
এই নিত্য ভাবপথের গভীর ব্যাপ্তির সদা বিকাশে হয়ে তৎপর।।

জগৎ মাঝে দেবতার সঞ্চার ঃ তুভাম অগ্রে পর্ববহন সূর্য্য।
বহতু এনা সহ পুনঃ পতিভ্যোঃ।
জায়াং দা অগ্রে প্রজয়া সহ।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/৩৮)

যজ্ঞের অগ্নি হয়েছে এখন মূর্ত পূর্ণতার পথে।
জগতের রয়েছে যা কিছু বাসনার বিস্তৃতি এই পর্বে।
হোক তারই নিত্য স্থিতি এই পথমাঝে পূতঃ অগ্নিব্রতে।
যে জীবন পথ হয়েছে ব্যাপৃত এই বিকাশের পর্বে পর্বে।
এখন হোক সাধন প্রজ্ঞার দ্রুত বিকাশ জীবনের পথচলায়।
যে ভাবপ্রদীপ হয়েছে শিখাময় হোক তারই নিত্য ব্যাপ্তি।
দৈবী চেতনের ক্ষণ বিকাশ দিয়েছে বিপুল দিশা জীবনে।
এখন হয়েছে তারই ক্ষণ এ দিব্য ভাবের জগৎ বিকাশে।।

দীর্ঘকালব্যাপী ভাগবতী ভাববৃত্তেঃ পুনঃ পত্নীঃ অগ্নি উদাত।
আয়ুষা সহর্বচলা।
দার্ঘায়ুঃ অস্যা যঃ পতিঃ
জীবাতি শারদঃ শতম্।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/৩৯)

দীর্ঘ এই কাল ব্যাপ্তি তোমায় করি স্মরণ চিত্ত মাঝে।
যে ভাববিকাশ ছিল এই প্রকাশ পর্বে হোক তার পূর্ণতা।
জীবনের পর্বে পর্বে হয়েছে যে নিত্য স্থিতি সদা প্রত্যয় পথে।
হোক তারই যজ্ঞ কার্য পূর্ণ ভাগবতী বিকাশের এই পর্বে।
এখন যে বার্তা ছিল জীবনের জন্য উন্মোচনের অপেক্ষায়।
হয়েছে তারই দিব্য আলোকের প্রকাশ দীপ্তির দৃপ্ত প্রাবল্য।
এই ভাবপথ হয়েছে সহস্র বিকাশের প্রধান শক্তি।
তোমায় পেয়েছে এই নিশ্চয় ভাব সংবেদ হয়ে চির প্রকাশী।।

জগৎ কল্যাণে জগন্মাতা ঃ মায়ের রূপটি জগতের জন্য কল্যাণময়। মায়ের সাধনে বহু সাধক মহামায়াকে জগৎ মুগ্ধকারী বলেছেন। তিনি জগতের এই ফুল ফল গন্ধ সৌন্দর্য দিয়ে জগতকে ভরিয়ে রেখেছেন। আবার ক্ষণও তার ভয়ঙ্কর রূপপ্রভায় বিপর্যয় দুর্যোগে ঝড়ে বন্যায় ভাসিয়ে ধ্বংস করে দেয়। কখনও বা রুক্ষ ভয়ানক তাপ বন্যায় মাটির ভিতরের সব রস শুষে নিয়ে ফুটি ফাটা খরার দাপটে সব যখন আর অন্ত্রের সূত্র ছিন্ন করে দিয়েছেন। আবার করুণার বর্ষায় সিক্ত হয়ে বহু ফসলের পসরায় ভরপুর জীবন জগৎময় ছড়িয়ে দিয়েছে তার অনন্যতায়। ধরিত্রীর বুকে সবই দিয়ে চলেছেন সবসময় সবারই জন্য। কর্ষণ কারীর ভাবনায় ধরা পড়ছে নিজের কৃতিত্ব। সে নিজে কর্ষণ করে জলের প্রবাহ দিয়ে সূর্যের তাপের সহযোগ নিয়ে করেছে জগতের জন্য খাদ্যের উপাদান প্রস্তুত। কর্ষক আর তার সঙ্গের দলবল সকলে নিজের নিজের কৃতিত্বে মশগুল। জগতের জন্য এই খাদ্য আর সহযোগী উপাদান তাদেরই দান। এমন ভাবনার বীজটি হল মায়ার দৃষ্টিস্নাত। মৌল সূত্রটি অনুধাবন হলেই বোঝা যাবে এমন ভাবনার ভিত্তি রয়েছে কিন্তু ভাবনাটির দৃষ্টিভঙ্গিটি অসত্যের ভারে ঠাসা। কর্ষক আর সহযোগী সব কর্মের উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে সত্যের একটি অংশ।

When the capital stock of any country is increased to such a degree that it cannot be all employed in supplying the consumption, and supporting the productive labour of that particular country and

surplus part of it naturally disagrees itself into the carrying trade, and is employed in performing the same office to other countries. The earring trade in the natural effect and symptom of great national wealth; but it does not seem to be natural cause of it. Those salesman who have been disposed to favour it with particular encouragement, seem to have mistaken the effect and symptom for the cause.

The expert of the home trade and the capital which can be employed init, is mecessarily limited by the value or the surplus produce of all those distant places within the country which have occation to exchange their respective productions with one and three; that of the foregien thade consumption, by the value of the surplus produce of the whole country and of what can be purchased with it, that of the carrying trade by the whole of the surplus produce of all different countries in the world.

(Adam Smith, The Wealth of Nations, 1776, Finger Print Classics Reprint 2023, p. 443)

সামগ্রিক উদ্যোগ যেমন হবে তেমন করে গড়ে উঠবে জীবন গড়ার উপাদান। এই সামগ্রিক ব্যবস্থাটি সবার মধ্যে হয়ে উঠবে নবীন ভাব বিকাশের সূত্র। কর্ষক আর ঐ কার্যের সব সমন্বয়ী সহযোগী মিলে জগতের মাঝে সঠিক ও দায়িত্ববান সব হয়ে সঠিক কার্য করেছেন। সবার অথবা অনেকের মধ্যে যখন একই কর্ম ব্যবস্থা ও কর্ম সমন্বয় গড়ে ওঠে তখনই তৈরী হয় জগতের জন্য প্রকৃত কর্ম বিকাশ সূত্র। জগৎ মাঝে এই পথ প্রবাহ ক্রমে এগিয়ে নিয়ে আসে এক সামগ্রিক ও সমন্বয়ী কর্ম। এই কর্মের কিছু মাত্রা নিজের নিজের স্বার্থ গণ্ডীতে আবদ্ধ যদিও একটি বড় অংশে বড় মাত্রায় তারই কর্মের পরিণত ফল জগৎ জনের একাংশ পেয়ে যায়। এর ফলে উৎপাদক ও অন্যান্য পরিচয়ের কর্মীদের কর্মাদি সবেরই একাংশে রয়েছে জগতের কল্যাণব্রতে সহযোগ করা। জগনমাতার জগৎ কল্যাণ ব্রত এমন করেই বহুজনের হাতে হাত মিলিয়ে কাজের মধ্যে রয়েছে নিহিত। কারও কর্মের মধ্যে যদি কল্যাণকারী উপাদান নিহিত থাকে সেই কর্ম হয়ে ওঠে জগন্মাতার অনুগামী কর্ম। এমন কর্ম জগন্মাতার তাঁর জগৎ লালনের উপাদানে বরণ করে নেন। এমন অবস্থায় হয়ে ওঠে জগৎময় মায়ের কৃপার বিস্তার। মায়ের কৃপাতেই এই জগতে গাছে গাছে পল্লবিত হয়ে চলেছে পুষ্প। ফুল ফল আর নানা খাদ্য উপাদানে ভরিয়ে দিয়ে জীবনের জন্য বিপুল অন্নের সম্ভার। উৎপাদক সরবরাহকারী প্রস্তুতকারী সকলেইএই বিপুল জগৎময় কর্মযজ্ঞের মাঝে একেকজন সহযোগী। এই সব সমন্বিত কাজগুলিই এনে দেয় জগতের জন্য অবাধ কৃপার দান। মায়ের কৃপাশক্তির সামগ্রিক বিকাশ হয় যখন সকলেরই সদিচ্ছার কর্মসংযোগ হয়। সাধারণভাবে এটি মিশ্র কর্ম। কিছু মানুষ থাকে যাদের কর্মের উদ্দেশ্য হয় ব্যক্তি স্থান পূরণ অথবা অকল্যাণের ভিত্তি দৃঢ় করা।

উত্তরণের পথে

মনুষ্য চেতনে ঃ

সোমঃ প্রথমৌ বিবিদে।
গন্ধর্ভ বিবিদ উতরঃ
তৃতীয় অগ্নিষ্ঠৈ পতিঃ।
তুরীয়ঃ তে মনুষ্যজাঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/৪০)

সাধন পর্বের অনুভব স্রোত হয় বিস্তার।
চেতনার স্তরে স্তরে অনুভবের এই নিত্য বিকাশ।
এখন দেবচেতনের এই মূর্ত পথ প্রকাশের উন্মোচনে
উপলব্ধির চেতন হবে প্রবাহিত জীবন চেতনের সব অঙ্গে।
যে ভাবধারা ক্রম সঞ্চারে হয়েছে বিস্তৃত জীবন পর্বে।
এখন তারই ক্ষণ নবীন চেতনের উৎস বিকাশের পথ মাঝে।
পরম্পরায় এই পর্বে এসেছে সত্য জ্ঞানের ক্ষণপ্রভা চেতনে।
নানা জীবন পরিচয়ে সীমা পেরিয়ে মানবেই দিব্য সত্য লাভ।

দেবচেতনে ক্রম রূপান্তর পর্বে ঃ

সোমো দদৎ এতৎ গন্ধর্বায়
গন্ধর্ব এতৎ অগ্নয়ে।
রয়িং চ পুত্র আশ্রয়দাৎঃ।
অগ্নিম অর্হাম অথৌ ইমম্।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/৪১)

সাধন অনুভব করেছে চেতন প্রবাহ জীবন প্রবাহে।
গন্ধর্ব প্রকাশ হয়েছে চেতনের এই বিপুল পর্বের উন্মোচনে
যে ভাব বিকাশ জীবন পথের নিত্য সঞ্চারে হয়েছে।
এখন মানব চেতনের গণপ্রবাহে জেগেছে তার বিকাশ আগ্রহ।
চেতনার রাজ্য হয়েছে দৃপ্ত সদা প্রত্যয়ের এই পর্বে।
হোক ঐ চেতনের মূর্ত উন্মোচন চেতনার দিব্য জাগরণ পর্বে।
আসুক ভাব বিকাশ এই মূর্ত প্রবাহে নিত্য স্থিত সাধনে।
এখন প্রশান্ত মনের নিবিড় নিবেদনের পর্বের জাগরণে।।

নবীন সত্যের বীজ সংগ্রহে ঃ

ইহা এব অন্তং বি যৌষ্ঠ।
বিশ্বম আয়ুব্য অশ্রুতম্।
ক্লীনন্তৌঃ পুত্রৈ নঃ তৃভিঃ
মা উদমানো এস এবৈ গৃহে।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/৪২)

সৃষ্টির এই নিত্য প্রবাহ পর্বে এসেছে সনাতন ধারা।
যে সত্য হয়েছিল আবিষ্কৃত এখনই নিত্য পথের সাধনে।
বিশ্বমাঝে এসেছে ভগবানের পথে এগিয়ে চলার আহ্বান।
উপলব্ধির এখন বিকাশ ক্ষণে সদ্য প্রত্যয় হোক দৃপ্ত।
যেমনে চলবে এগিয়ে জীবন পর্ব হবে চয়ন ক্রম সত্যের।
ব্রহ্ম জীবনের এই পূর্ণ আনন্দের ক্ষণ প্রকাশ হবে এখন।
ঐ সত্যেরই বীজ এখন মনের প্রকাশের পূর্ণতার অভিলাষে
এখন নিত্য নিরঞ্জন হোক সত্যের ডালির উন্মোচনের পর্বে।

উত্তরণের এই পর্বে ঃ

আনঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিঃ।
আজঃ এসায় সমনয়ন বর্মাঃ।
অদঃ মঙ্গনৌঃ পতিলোকমা বিশ।
শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/৪৩)

মানবের এখন সত্য লাভের ক্ষণ বহুজনের মাঝে।
যে ভাবপ্রদীপ নিত্য প্রকাশের ক্ষণ পর্বে হয়েছে।
বিকশিত জীবনের ফুলে ফুলে ভরে চতুষ্পদের সহযোগে।
এই নিত্য পর্বের সদা প্রবাহ এখন অনুষ্ঠিত হয়ে যায়।
ঐ ভাবপর্ব হবে নিত্য বিকাশের অনুরাগী সত্যের।
মানবের সত্য এখন হবে নবীন ভাবমাত্রায় ধারণ জীবন মাঝে।
দেবতার দান এসেছে জীবনে এই চেতন অভিযান পর্বে।
উত্তরণের এই পর্বে হয়েছে সবই ব্যাপ্ত দিকে দিকে।।

উত্তরণের পথে মনুষ্যচেতন ঃ নিজেকে কর্তা ধরে নিয়েই সব অহং স্নাত কাজ আর উদ্যোগ। অহং এর এমনই দাপট যে দৃষ্টিকে আর বিচার সামর্থকে সীমিত করে দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন অহং এর দাপটে ন্যাবা হয়ে যায়। সবেতেই নিজের বিশেষত্ব খুঁজতে গিয়ে ভগবানকে হারিয়ে ফেলে জীব। ভগবান অন্তরে বিরাজমান—এটি শুধুমাত্র ধারণা বা কথার কথা হয়েই থেকে যায়। সাধন পথে যিনি এসেছেন, তার জন্য ঐ হৃদয় গুহার মধ্যে কিছু সত্যিকারের উপলব্ধির বিষয় আছে কিনা খবর খোঁজ করার দায় আছে। 'ধর্মস্য তত্বম নিহিতং গুহায়াম্'— এই বার্তা ঋষির ধ্যানজাত। বেদ প্রকাশের সূচনার পর্ব থেকেই হয়েছে সঞ্চারিত ভাগবতী সদা প্রজ্ঞাপ্রসূত এই বিকাশের মধ্যে দিয়ে। উত্তরণের সবচেয়ে প্রশস্থ পথ হল কর্ম। সাধারণভাবে কর্ম সকলেই করে

চলেছে। জীবন ধারণের জন্য কর্মাদি জীবনের আদি পর্ব থেকেই হয়ে চলেছে স্বতঃই। এমন করেই যে কর্ম সম্পাদন হয়ে চলে। এমন করেই শুরু হয় প্রথমেই হয়ে যায় এমন করেই কর্ম সম্পাদন হয় নিষ্কাম কর্মই প্রকৃত কর্ম। এই কর্ম সম্পাদনটি জগতের জন্য হয়ে ওঠে গভীর কর্মের মাঝে হয়ে ওঠে নিপুণ কর্ম সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে হয়ে উঠবে নিত্য নিরঞ্জনের মধ্য দিয়েই সব কর্মের ফলস্বরূপ এই জগতের সার্বিক নিবেদনম। কর্মানুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ ক্ষণ হল যখন মনের মাঝে ফুটে ওঠে নিবেদন। এমন ক্ষণ যেখানে নিবেদন হয়ে উঠবে নিজেরই পক্ষ নিজের নিবেদনকে এগিয়ে দিয়ে ভগবানের কাছে ঐ নিবেদন যেন প্রকৃত এক সত্যময় নিবেদন হয়ে ওঠে। এই সত্যময় নিবেদন জীবনের উত্তোরণের ব্যাপক ভিত্তিভূমি রচনা করে দেয়। উত্তরণ হল নিজেকেই ছাপিয়ে যাওয়া। নিজেই নিজের সীমাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে হয়— কৃপাশক্তির আহ্বানেই হয়ে ওঠে উত্তরণের পূর্ণতা।

The art of war, however, as it is certainly the moblest of all arts, so, in the progress of improvement, it mecssarily becomes one of most complicated among them. The state of mechanical, as well as some other arts. With which it is necessarily connected, determines the degree of perfection to which it is capable of being carried to any particular time. But in order to carry it to this degree of perfection it is necessary that it should become the sole of principal occupation of a particular class of citizens, and with division of labour is as necessary for the improvement of this, as of every other art. Into other arts the division of labour is naturally introduced by the produce of individuals, who find that they promote their private interest better by causing themselves to a particular trade than by excrising a great number. But it is the wisdom of the state only, which can render the trade of a soldier a particular trade separate and clear from all others.

(Adam Smith, The Wealth of Nations, 1776, Finger Print Classics Reprint 2023, p. 784)

প্রতিটি কর্মের মধ্যে নিহিত রয়েছে কর্মের বীজ। কর্মের বীজ থেকেই হয়ে ওঠে নিত্য বিকাশের পটভূমি। আচার্য রামানুজ ক্ষর এবং অক্ষর পুরুষকে যথাক্রমে বলেছেন বদ্ধ আত্মা আর মুক্ত আত্মা। তাঁর মতে বদ্ধ আত্মারূপে জীবাত্মা জগতের মানবের জন্য সীমায়িত চেতনার দান করেছেন। এই সীমায়িত চেতনার প্রকাশ জীবনের জন্য উন্মোচনকারী। এটা কর্মের কলা ও কৌশল জীবনের কলা ও কৌশল সব কার্যের মধ্যে নিহিত থাকে আবার প্রতিটি কর্মের রয়েছে নিজের যুক্তির পরম্পরা। যুক্তির এই পরম্পরার হাত ধরে গড়ে ওঠে কর্মের সব উন্মোচন ক্ষেত্র। কর্মের যুক্তি ভিত্তি হল এর জড় বিজ্ঞান ও জড় প্রযুক্তির ক্ষেত্র। আবার এরই উপরে রয়েছে ঐ কর্মের মাঝে অন্তর্নিহিত সংজ্ঞা। সব কর্মেরই রয়েছে এই অন্তর্নিহিত সংজ্ঞার ক্ষেত্র। এটি হল কর্মের মধ্যকার প্রজ্ঞার ক্ষেত্র। প্রজ্ঞা হল কর্মের মাঝে ভগবানের স্পর্শের অনুভব। সব কর্মেরই মাঝে বীজপ্রজ্ঞা হল কর্মের মধ্যেকার ভগবত্তা। প্রতিটি কর্মই এমন করে ভরে ওঠ প্রজ্ঞার কর্ম স্বতঃই প্রতিটি কর্মের মাঝে ভগবত্তার সম্পর্ককে আবিষ্কার করে নেয়। কর্ম সম্পাদন এমন করেই হয়ে ওঠে ভাগবতী প্রেরণার ক্ষেত্র। নিজের কর্মের মাঝে কর্মের কৌশল ও প্রাবল্য কর্মের পরিণতির পথকে প্রশস্ত করে দেয়। খুঁজে নিতে হয় কর্মের মাঝে বিদ্যমান এই কর্মচেতনাকে। যে কর্মচেতনাটি হয়ে থেকে জীবনের জাগরণের নিরীখে সেটিই হয়ে ওঠে কর্মের পথ দিয়ে উত্তরণের চৈতন্য বিকাশ পর্ব। বিকাশ পর্ব স্বতঃই হয়ে ওঠে সদা প্রকাশশীল। এমনই এই বিকাশ পর্ব যে স্বতঃই জীবনকে নবীন চেতনার সংযোহ ঘটিয়ে দেয়। এমন করেই হয়ে ওঠে জগতের এই জীবন প্রবাহের মাঝ স্বতঃ হয়ে ওঠে মহাক্রিয়াশীল বিপুল মুক্ত চেতন প্রদীপটি নিয়ে জীবনের মাঝে ফুটিয়ে তোলা ঐ প্রকাশ পর্বের চেতনাটি। ভগবানকেই যে সাধক পারবেন অন্তর চেতনে আঁকড়ে ধরতে তারই উত্তোরণ পর্ব এগিয়ে চলবে। এই মানব চেতনের স্থান অবিহত হবে ব্রহ্ম চৈতন্যের আবার অফুরন্ত দানে। উত্তরণ তখন হয়ে উঠবে মজবুত।

প্রাণে প্রাণে দৈবী প্রেরণার দীপ্তি ঃ

অঘোর চক্ষুঃ পতিঃ অঘ্নয়ে এধি।
পিতাঃ শিবাঃ পশুভ্যঃ সুমনা সুর্বচাঃ।
বীরসু দেবঃ অকামা।
ম্যোনা শং নো ভব দ্বিপদে শং চতস্পদেঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/৪৪)

ঐ দিব্য প্রভা হয়েছে প্রকটিত জগৎ মাঝে।
যে প্রাণ চেয়েছে ভগবৎ প্রভা এই জীবন মাঝে
হয়েছে তারই এই জগৎ পথ উন্মোচন জীবন প্রবাহে।

যে ভাবরাজি জীবনের জন্য হয়েছে অবলম্বন সত্যের পথে।
এখন এসেছে ক্ষণ ভাগবতী ভাবদীপ্তির প্রাণে গ্রহণে।
জগন্মাতার কৃপাপরশে হয়েছে জগৎ মাঝে দেবতার স্থিতি।
প্রাণের আবেশ এখন সর্বত্র করবে বিকশিত ভাগবতী ভাবদীপ্তি।
চেতনার এই ব্যাপ্ত সংবেদ হোক বিস্তৃত জগতের মুক্ত ক্ষেত্রে।।

প্রজ্ঞা পরম্পরা বিস্তৃত হয়েছে বিশ্বময় ঃ

ইমাং ত্বম্ ইন্দ্র মীদবঃ।
সুপুত্রাং সুভাগাং কৃণু।
দশাস্যাং পুত্রানাং ধোহি।
পতিম এয়াকাদশং কৃধিঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮৫/৪৫)

দেবতার এখন মাতৃরূপের প্রকাশ উন্মোচন পর্ব।
জগতের কর্ম মার্গে এসেছে দেবতার কৃপাস্পর্শে স্বতঃই।
যেমন করে হয়েছে চেতনার জাগরণ নিত্য দৃপ্ত পর্বে।
অনন্ত বিকাশের পর্ব মাঝে হোক তারই উন্মোচন প্রজ্ঞার।
যে ভাবপ্রবাহ এসেছে নিত্য পথের এই পর্বের দৃপ্ত বিশ্বাসে।
মাতৃ করুণার পরশে হয়েছে তারই নিত্য স্থিতি এই বিকাশে।
যেমনে হয়েছে মূর্ত ভাব সংবেদ জীবনের সর্বত্র হয়ে ব্যাপ্ত।
প্রজ্ঞা পরম্পরায় শত প্রাণে হোক তারই মূর্ত প্রকাশ ব্যাপ্তি।।

বিশ্বাত্মক সাধন ঃ বিশ্বময় ব্যাপ্ত এই সাধন চেতন ফুটে রয়েছে সর্বত্র। ফুল হয়ে রয়েছে তিনি ফুটে কিন্তু সঙ্গে রেখেছেন বিঁধে দেবার কাঁটা। ফুল তার সুন্দর পাপড়ি মেলে ধরেছে মায়ের এই জগতকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে। আবার এরই সঙ্গে রয়েছে যন্ত্রণার বিষ ফুটিয়ে দিতে এই জগৎ ব্যাপ্ত মায়ের সুন্দর প্রকৃতির মাঝে মনের প্রস্তুত হবার দিক। জগতের মাঝে যা কিছু হয়েছে এই সুন্দর প্রশান্ত সুষম বিশ্বমাঝে ফুলের সৌন্দর্য দিয়ে জীবন ভরে উঠবে তখন যখনই ঐ সুন্দর প্রকাশের অভ্যন্তরে গভীর চেতনায় বিধৃত যে চেতন সত্বা তাকে যখন যাবে বোঝা এবং যার সৌন্দর্যের প্রকাশ হয়ে ওঠে জীবনের মাঝে বিস্তৃত জাগ্রত চেতনের সূত্র। এই জগৎ চেতনই জীবনের সব বন্ধনের প্রাচীরগুলিকে ভেঙে খান খান করে দেয়। জীবন যখন ভগবানকে আশ্রয় করে তখনই ফুটে ওঠ জগৎ মাঝে সত্যের প্রকৃত প্রভাক্ষেত্র। ভগবানই সত্য, তিনি শাশ্বত সনাতন সবার জন্য তিনি আশ্রয়। তিনি কল্যাণকারী, তিনিই স্বয়ং কল্যাণকারী এক অনন্ত শক্তি।

নিবাস ঃ শরনং সুহৃৎ-ভগবান শাশ্বত সনাতন স্বতঃই সকলের আশ্রয়। তাঁকেই শরণে বরণ করতে হয়। তিনিই জীবনের প্রকৃত বন্ধু। ভগবানই জগতের সর্বত্র সর্বময় সুন্দর এই প্রকৃতি আর অনন্ত প্রসারী সম্পদ করেছেন বিস্তৃত। সম্পদে ভরপুর এই জীবন কত চমৎকারী কার্য করে দেয়। জগতের সম্পর্কের জালে জড়িয়ে আশা প্রত্যাশা সবই যেন মানুষকে বশীভূত করে দেয়। জগৎময় চমৎকারীত্ব এক ঘণীভূত মায়ার বিস্তার। মায়ার জালে জড়িয়ে সর্পের অবয়বে রজ্জু জ্ঞানকারী ভ্রম করে চলেছে মানব। হয়তবা জাগতিক প্রীতির হাতছানির খুশি তৃপ্তীকে আনন্দ জ্ঞানে একান্ত প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়ে তৃপ্তী প্রসাদ রয়েছে। জীব এই তৃপ্তীর মায়ায় বদ্ধ হয়ে ক্ষণানন্দের মহীমায় ভরপুর আগামীর বিষাক্ত কাঁটা অপেক্ষমান সময়ে ফুটে যায়। ভবিষ্যতের বিষয় তাই জীবনের এই প্রবাহমানতায় বোঝা যায় না তার অবস্থাকে বর্তমানের কালক্ষণে।

মায়াধীশ ভগবান জগৎময় আপাত খুশি তৃপ্তির সম্ভারে ভরিয়ে রেখেছেন। যে চায় সব সম্ভোগ অথবা সাময়িক সম্ভোগ সে মিষ্টি কথার মায়ায় মুগ্ধ হয়েই বিরাজ করবে বর্তমানের সুখ সন্তোষ উপভোগ করেই এগিয়ে যাবে। ভগবৎ আহ্বান চলে যাবে দূরের সারিতে। ক্ষুরস্য ধারম্-সূক্ষ্ম যে ভাবকে আঁকড়ে থাকতে হয় সেটি ভুল হয় তারা। 'স্বাং মায়া, মূল প্রকৃতিং বশীকৃত্য'—নিজ মায়ায় ভগবান সর্বিত্র সুবর্ণময় করে তোলেন জগতের সুখাকাঙ্ক্ষীকে। যে ভগবানকে চায়—সেই পারে জগৎ মাঝে তার সাধন প্রতিজ্ঞার পরিপূর্ণতায় শুধুমাত্র ব্রহ্মাপর্ণের প্রজ্ঞা বরণ করে নেয় জীবনের জন্য ভগবানকেই বরণ করে নিয়ে সাধন প্রতিজ্ঞা পূরণের এই ক্ষণ।

—ঃঃ—

হয়েছি শরণাগত শ্রীভগবানে

সায়ক ঘোষাল

ভগবৎ ভাবপূর্ণ মন সর্বদা ডুবে থাকে ভগবানের ভাবে। এই মনই হয়ে ওঠে বিশ্বাসী মন জগৎ মাঝে। জগৎ নানা রকমের নানা প্রকারের সময় লেগে থাকে জীবনের জন্য। জীবন এই সময়ের বা এই ঘটনার বলে বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রভাবিত হয়। কিন্তু ভগবৎভাবে বিশ্বাসী একজন প্রকৃত মন কখোনোই কোনো জাগতিক সূত্রে প্রভাবিত হয় না। সেই ভক্তমন জানে যেটাই হবে বা যেটাই ঘটবে সবকিছুর আগে বা পরে তার সাথে ভগবান সর্বক্ষণ আছেন। যাই ঘটে থাক সেভাবেই জীবন প্রভাবিত হোকনা কেন ভক্ত মন সর্বদাই তার ভগবানকে আহ্বান করে চলবে। ভগবানের আহ্বানের শক্তিতেই জেগেছে চেতন শক্তি জগৎ মাঝে। এ জীবন তোমারই দান যা এক সুযোগ তোমারই সাধনায় মত্ত হওয়ার। তোমার নিত্য নবীনের প্রকাশ মাধুর্যেই ডুবে যেতে চায় মন। তোমারই মন্ত্রের সাধনার করেছে নিয়ে প্রত্যয়-এ জীবন শুধু তুমিই জীবনের কেন্দ্র হয়ে বিরাজ করছ জীবনে। এখন জীবন হয়ে উঠবে সত্যময় ভরপুর। তিনি সত্য হয়ে বিরাজ করছেন জগৎ মাঝে। তিনি সত্য ত্রাণ রূপে। ভগবান সর্বদা সঙ্গে রয়েছেন প্রতিটি স্থানে প্রতিটি ক্ষণে তিনি সঙ্গী হয়ে রয়েছেন। প্রতিটি ক্ষণে তাঁর চোখ তাঁর শ্রবণ তাঁর প্রিয় ভক্তের দিকে রয়েছে। তাই এখন জীবনে অঙ্গিকারের মুহূর্ত হয়ে এসেছে ভগবৎ অঙ্গীকার -Divine commitment যা জীবনকে ভগবৎ পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই সেই প্রতিজ্ঞা যা জীবনের পরমতম সত্যের প্রতিজ্ঞা। এই জীবনেই হয় ভাগবতী ভাবসঞ্চার উদ্‌ভাষিত করবে। ধীরে ধীরে ভাগবতীভাব সঞ্চারে ভক্তি গাঢ় হয়ে ওঠে। জীবনে জগতের সব বাধা ত্যাগ করে ভক্ত এগিয়ে চলে তার ভগবানের দিকে। জীবনে বাধাই নির্মাণ করে দেয় কে কতটা। সামর্থ নিয়ে কোনো অঙ্গীকারে স্থিত হয়ে টিকে থাকতে। জীবনের অঙ্গীকার শুধু ভগবানকে চিন্তন আর ভগবানকেই কেন্দ্র করে জীবনকে সমর্পিত করা ভগবানের প্রতি। ভগবৎ অঙ্গীকারই মন কখোনো কর্মের ত্যাগ করে না বরং কর্মকে ভগবানের দেওয়া দিব্যকর্ম রূপে সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা করে। কর্ম চিন্তা ও কর্ম ক্রমে জীবের চরিত্র গঠনে সাহায্য করে যদি মনে ভাগবতী ভাবসঞ্চারের প্রকাশ থাকে। দিব্য এই প্রজ্ঞার উন্মোচনে প্রাণের বিকাশ যে সংবেদ হয়েছে তিনি তা আরও তীব্র হয়ে উঠবে ভক্তির এই গাঢ় ভক্তিতে। এই প্রজ্ঞাবান ভক্তি সংবেদ নিয়ে আসবে নবীন চেতনের ভাব বিকাশ জগৎ চেতন পটে। এইভাবে জীবনে হোক তোমার নবীন অহবান জীবন মাঝে দেবশক্তি হোক জাগরণ জীবন পটে। জীবন হয়ে উঠুক দেবতার স্পর্শে দিব্যজীবন যা চির সমর্পিত থাকবে ভগবৎ সম্পর্কে। আলোর পরশে আলোকিত এই দিব্য জীবনই জগতে আহবান করে নিয়ে আসতে ভগবৎ অঙ্গীকার জীবনে জীবনে। জগৎ মুগ্ধ হয়ে উঠুক এই প্রজ্ঞাবান জীবনের আলোক প্রকাশে যা দেবতার দানে দেবতার প্রসাদরূপে নেমে এসেছে জগতের পটে। এই জীবন হল ফুলের মতো। এই পুষ্প কেমন তার সুভাষ এবং রূপে জগৎকে মুগ্ধ করে তোলে জগৎকে একটি স্নিগ্ধ রূপের সুন্দর জীবনের প্রত্যাশা জাগিয়ে দেয় কিন্তু পুষ্প নিজের তার সুভাষ গন্ধ বা রূপে প্রভাবিত হয় না সে তার শুধুমাত্র কর্ম করে চলে। ঠিক এই রকমভাবে একজন ভক্ত একজন প্রজ্ঞাবানের আলোর ধারায় জগৎ প্রভাবিত হয় ঠিক এমন ভাবেই। ব্রহ্ম সনাতন স্বপ্নে হয়েছেন প্রতিভাত জগতের পটে জগতের সুরক্ষায়। যখনই হয়েছে জাগরণ প্রত্যয়ের নীরিক্ষে জগৎ মাঝে তখনই জেগেছে মহাপ্রাণ এই সৃষ্টির মাঝে। এই মহাপ্রাণই সমগ্র জগৎকে করে তোলে উদ্‌ভাষিত এখন এই মহাপ্রাণের পূর্ণ সত্যের উন্মোচন হবে এই জীবন পর্বে। এই জীবনগুলিতে মহাপ্রাণের রূপে ভগবতী প্রভার জাগরণ হয়ে প্রতিটি জীবন হয়ে উঠবে আলোকময় পুষ্পের মালা। এই রকমভাবেই সাধনপ্রজ্ঞা রূপে প্রতিটি জীবন হয়ে উঠুক আলোক পুষ্পমালা। জীবনের বাহ্যরূপ এই সাধন প্রজ্ঞার বার্তায় কখনই ক্ষণিকের রূপ বদল করে। এইভাবে ক্ষণিকের রূপবদল করে। এইভাবে ক্ষণিকের বদলে জীবন যখন বাহ্যরূপের পরিগ্রহ অন্তরের আকূতিকেও উন্মোচন করে তুলবে তখন হয়ে ওঠে অন্তর এবং বাহ্য একই ভাগবতী বার্তাবহ রূপ। জীবনের এই ক্ষেত্রে নেমে আসে দুটি ক্ষেত্রে জাগতিক সত্য এবং ব্রহ্মসত্য। যখন জীবন সাধন ক্ষেত্রে প্রতিভাত হয়ে ভগবৎ ভাব সঞ্চারী হয় ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন মন হয়ে ওঠে ব্রহ্মসত্যে ভরপুর। ব্রহ্মসত্য সর্বদাই সঞ্চিত থাকে হৃদয় কেন্দ্রে। ব্রহ্ম সত্যকে করতে হবে মন্থন। ভক্তমন হল পাত্রে পরিপূর্ণ পরমান্ন যাকে মন্থন করতে করতে ভগবৎ ভাব সঞ্চারি ব্রহ্মাবতেঃ উত্থান ঘটবে। এই ব্রহ্মামৃত হল অন্তরে ডুবে গিয়ে সেই গভীর প্রদেশে ভগবৎ আনন্দে ডুবে গিয়ে নিত্যপ্রবাহের উপলব্ধিতে স্বাদ অনুভব করা যা জড় সীমা অতিক্রম করে বিশ্বময় ব্যপ্ত সেই চেতনা স্বত্তাকে বরণ করে। তাই জীবনের অঙ্গীকার হয়ে উঠুক ভগবৎভাব সঞ্চারে ভক্তি প্রজ্ঞার ও কর্মের প্রবাহে সেই ব্রহ্মামৃত উপলব্ধির দিকে অগ্রসর হওয়া যা আমাদের হৃদকেন্দ্রে পাত্রস্থ হয়ে রয়েছে কতকালব্যপী। ভগবৎ প্রাপ্তির অঙ্গীকারই জীবনের পরমতম উদ্দেশ্য হয়ে উঠুক।

—ঃঃ—

দিব্য আলো

পার্থ সুন্দর ঘোষ

মনের বিভিন্ন অবস্থা। মন দিশা করতে পারে না কোন দিকে যাবে। অস্থির মন সুস্থির হতে চেয়েও পারে না, ক্রমশঃ অন্ধকারেরই চলে যায়। অন্ধকারে থেকে মনটি দিশা করতে পারতো না কোনদিকে যাবে। চর্তুদিক অন্ধকার, সেই মনটি ভারতে পারে নি এমন কোন স্থান আছে আলোকময়। এমন আলো আছে যা অন্ধকারময় স্থান ভেদ করে মন নামক বস্তুর উপর প্রতিফলিত হচ্ছে।

অজ্ঞানতা ও হিংস্রতা ছিল অন্ধকার স্থানে। ঐ দিব্যলোক প্রবেশ করে ঐসব হিংস্রতা অজ্ঞতা সরিয়ে আলোর প্রবেশ ঘটালো এবং ঐ মনটি ভগবত চিন্তনে জারিত হলো। বহু মাইল দূর থেকে সূর্যরশ্মি এসে যে বস্তুতে বাধাপ্রাপ্ত হয় সেই বস্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। দিব্যালোক আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। দিব্যালোক এসে যে মনের উপর কৃপাদৃষ্টি দেবে, সেই মনটি। দিব্য আলোকপ্রাপ্ত হবে। হৃদমাঝারের জ্ঞানভাণ্ডারের ঢাকনাটি সরাতে পারলেই দিব্যালোক এসে পরবে। কেবলমাত্র কৃপা হয়েই এই জ্ঞানভাণ্ডারের ঢাকনাটি সরতে পারে। নিজের শত চেষ্টাও শত ইচ্ছাতেও সরে না। কিন্তু যেই মাত্র ভগবত কৃপা হবে। তিনি নিজেই ঢাকনা সরিয়ে দেবেন। দিব্যালোক মনটিকে আলোকিত করবে। ভক্ত যে বারংবার প্রার্থনা করে তাই তিনি অনুরোধ ফেরাতে পারেন না। ঠাকুর বলেছেন "ঈশ্বরলাভই জীবনের উদ্দেশ্য। এবং যেন তেন প্রকারে ঈশ্বরলাভ করতে হবে।

সত্য ও সরলজীবনযাপনে ঈশ্বর পথে থাকতে হবে। কর্মজগতেও সত্য পথ অবলম্বন করতে হবে। সংসারী মানুষের মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে থাকতে হবে। মানবিক জীবন কর্মের বন্ধন। যেকটি কর্ম assign করা আছে সেকটি কর্ম করতেই হবে। কিন্তু ঐ অবধি তার ফলাফলের কথ্য চিন্তার মধ্যে আসবে না। কর্ম থাকলেই কর্মফল থাকবে। কিছু ফল তৃপ্তির হতে পারে কিছু অতৃপ্তির ফলওনিয়ে যেতে হবে।

জগত নিরন্তর কর্ম করে চলেছে। এই সব কর্ম যোগ করলে হয় জগতকর্ম। এই জগত কর্মের মধ্যে ভালও মন্দের মিশ্রিত কর্ম চলছে। জগতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে শ্রীভগবান অবস্থান করে আছেন। এই সৃষ্টি তাঁর। এই মিশ্রিত কর্মের ফলাফলও মিশ্রিত কর্মফলই হবে। এটা নিশ্চিত ভাবে বলা যেতে পারে এই মিশ্রিত কর্মফলের গড় বা average ভাল কর্মফল। অর্থাৎ জগতে ভল কর্মই বেশী এবং তাই জগত প্রবাহমান।

তাই তো আমরা মায়ের কাছে প্রার্থনা করবো এই দিব্যলোক পৌঁছে যাক প্রতিটি প্রাণে। প্রতিটি প্রাণ সতত সংপৃক্ত থাকুক ভগবত চিন্তনে। জাগতিক কর্ম চলুক সত্য পথ। অবলম্বনে, কর্মফলে জীবতনু উপলব্ধি করুক সুফল। দিব্যালোক সঞ্চারিত হোক প্রতিটি জীবতনুতে।

জয় মা জয় মা জয় মা।

—ঃঃ—

ফুটে আছেন ব্রহ্মকমল, ব্রহ্ম স্বয়ং

মনোজ বাগ

ফুটে আছে যেন ব্রহ্মকমল সমগ্র ব্রহ্ম জুড়ে। যেন স্বতোঃপ্রকাশিত হয়ে আছেন স্বয়ংক্রিয়, স্বয়ংসিদ্ধ স্বয়ং। তাঁর পাপড়ি সকল প্রকাশিত হয়ে আছে তার সমগ্র সত্তা জুড়ে। দুচোখের দৃষ্টি যত দূর পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে, ততটা ক্ষেত্র জুড়েই দেখছি এই ব্রহ্মকমলেরই প্রকাশ। বাহ্য দৃষ্টি বাহ্যত যা দেখছে, অন্তর্দৃষ্টি অন্তর্দেখায় যত গভীর পর্যন্ত আন্দাজ করতে পারছে, সবটাই এই ব্রহ্মকমল বা কমলরূপী ব্রহ্ম স্বয়ং। শ্রবণ যা শুনছে, তা এই কমলরূপী ব্রহ্মেরই স্পন্দন-তাঁর প্রণব- তাঁর ওঙ্কার-তাঁর নাদ, শ্রুতি, ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। ঘ্রাণেন্দ্রিয় জুড়ে আছে এই ব্রহ্মকমলটিরই দিব্যগন্ধ। পূর্ণব্রহ্মকে, পরমসত্য-সনাতনকে কমল রূপে কল্পনা করলে আমাদের মহাজাগতিক বাস্তবতাটি এ রককমই।

বাস্তবেও ব্রহ্মকমল নামের সাইনারিয়া গোত্রের একটি সপুষ্পক উদ্ভিদ হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, ভারতের উত্তরাখণ্ড, মায়ানমারের উত্তরাংশ, দক্ষিণ-পশ্চিম চীন জুড়ে পাওয়া যায়। এই গাছের ফুলই ব্রহ্মকমল-যা সাধারণত বছরের একটি বিশেষ সময়ে, জুলাই মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাসের রাত্রিকালে কয়েক ঘণ্টার জন্য ফোটে। আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়েও যায়। জনশ্রুতি আছে প্রস্ফুটিত ব্রহ্মকমল দর্শন পরম সৌভাগ্যের। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কারে এই ফুলটিকে খুব পবিত্র মানা হয়। ফুলটি ভেষজগুণ সম্পন্নও। এই ফুল নিয়ে অনেক মিথও আছে। মিথের চর্চা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়।

সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাই এই কমলরূপী ব্রহ্ম। প্রকাশিত হয়ে আছেন তাঁর স্বমহিমায়। আমরা এই কমলেরই অংশবিশেষ। কেউ অতি ক্ষুদ্রকণা মাত্র, কারো বা বিরাটরূপ— কেউ নিতান্তই তুচ্ছ প্রচল সমাজের নিরিখে, যে কেউ বা দরে মহার্ঘ — পরম সত্যে এসবই এই ব্রহ্মকমলেরই ছোট-বড় পাপড়ি, দল। তাঁর অংশ। আমাদের সবার অবস্থান তাঁতেই, আমরা সবাই তাঁর সঙ্গে ওতোপ্রোত। আমাদের চারপাশের জগৎ এই কমলই। নিজেতে নিজেই ফুটে আছেন তিনি। চোখ ফোটা মাত্রই আমরা দেখি এই ব্রহ্মকমলকেই। দেহে চৈতন্য জাগা মাত্রই আমরা অনুভব করি এই ব্রহ্মকমলকেই। আমৃত্যু আমাদের সব জানা, শোনা, বোঝা এই ব্রহ্মকমলকেই বা রূপকার্থে কমলরূপী এই ব্রহ্মকেই। প্রতিটি প্রাণের অভিব্যক্তি এই ব্রহ্মকমলেরই বোধ অভিব্যক্ত করে তার মতো করে। আমাদের ঋষিত্ব এই ব্রহ্মকমলটিকেই অনুভবের সাধনা। আমাদের বিজ্ঞান এই ব্রহ্মকমলটিরই নিরন্তর সমীক্ষা। জীবদেহে আমরা সদাসর্বদা বিচরণ করছি এই ব্রহ্মকমলেই, দেহে প্রাণ ঘুমিয়ে গেলে আমরা পরম নিদ্রায় বিলীনও হই এই কমলরূপী ব্রহ্মেই। ঋষি বলছেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা কিছু আমরা দেখছি, জানছি, এর বাহিরেও যা কিছু জগতে আছে, এই সমস্ত কিছু যা থেকে জাত, যা-তে স্থিত, এবং বিনাশকালে যা-তে তিরোহিত হয়ে বিলীন হয়, তিনিই ব্রহ্ম। তিনিই পরমেশ্বর।

"যত বৈ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপয়ন্তি অভিসংবিশন্তি, তৎ বিজিজ্ঞাসস্য, তৎ ব্রহ্ম এতি"। —(শ্বেতাস্বেতর উপনিষদ)

মানব সভ্যতার বিরাট সম্পদ তার রত্নভাণ্ডার সমৃদ্ধ সমুদ্রপ্রমাণ শাস্ত্ররাজি। বাক্যের গঠন, ভাষার আঙ্গিক, ভাবের অভিব্যক্তি সে যাই হোক এই বিপুল পরিমাণ শাস্ত্ররাজির প্রতিটি তত্ত্ব, স্তোত্র, বাণী, প্রতিটি মন্ত্র— সবই এই কমলরূপী ব্রহ্মকে নিয়েই। আমরা এই সব শাস্ত্র পড়ে জানি এই ব্রহ্মকেই। বিরাট ভাবে জানি তাঁর বিরাট অবস্থাকে, সামান্য ভাবে জানি তাঁরই সামান্য অবস্থাকে। আমাদের সমগ্র স্মৃতি জুড়ে আছেন এই ইনিই। আমাদের সব জ্ঞান, বোধ-বুদ্ধি এই এঁনার থেকেই জাত। শাস্ত্র বলছেন, তিনি অবাঙ্মনসগোচর। সেটি তাঁর বিভু রূপ। তাঁর বিভুরূপের হদিশ পাওয়া জগতের কোন ব্যক্তিরাই সাধ্য নয়। আবার এই শাস্ত্রই বলছেন, তাঁকে জানেন না এমন একটি প্রাণীও জগতে নেই। এই জানা রূপটি জগৎ। আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে আছেন তিনিই। "ঈশা বাশ্যম ইদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"— (ঈশোপনিষদ)। আবার আছেন আমাদের অন্তর জুড়ে আমাদের প্রাণময়, হৃদয়ময় হয়ে। কারণ তিনিই আছেন। আমরা বস্তু, তিনি উপাদান। তাঁতেই তৈরি আমরা এবং আমাদের জগৎ ও জীবন। তাই তিনি আছেন আমাদের অন্তর ও বাহিরের সবটুকু জুড়ে। জীব বস্তুগতভাবে এই তাঁরই উপাদান বা বস্তু। প্রাণগত ভাবে প্রাণ, এই পরমেরই স্পন্দন। জীবের জীবনবোধ, ব্যক্তি সংস্কার যতক্ষণ তার ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায় সংহত হয়ে আছে, ব্যক্তি যতক্ষণ ব্যক্তি হয়ে আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে হয়ে আছে জীবমাত্র। ততক্ষণ পর্যন্ত সে দেখেও দেখছে না পরম সত্যটি, শুনেও শুনছে না পরমের ধ্বণিটি, সুরটি। ক্যাওসকে সুরের আসন দেয় নি সঙ্গীত শাস্ত্রগুলি। কিন্তু যে মন এই ব্রহ্ম সত্যকেই সদা সর্বদা অবলোকন করছে, তার মনপ্রাণ এই এই পরমেই একাত্ম হয়ে আছে, তাঁর শ্রবণে ক্যাওসও যে সুরে বাজছে। অর্থাৎ পরম সত্যকে, জগৎ জুড়ে ফুটে থাকা কমলরূপী পরম ব্রহ্মকে যিনি তাঁর নিত্য দেখায় দেখছেন, তার ব্যক্তিত্বের আর অন্য আবেশে সব শূন্য হয়েই আছে। এই শূন্যাবস্থায় ব্যক্তি তখন সামনের সব কিছুতেই দেখছেন পরম পূর্ণকে। এবং এই অবস্থাটিই জীবনের পরম অবস্থা। এই পরম অবস্থায় যে কোন জীবই যা দেখছে, তা এই কমলরূপী ব্রহ্ম স্বয়ং।

এই পূর্ণকে যিনি উপলব্ধি করছেন, নিজে তিনি শূন্য হয়ে আছেন। নিজে শূন্য হবার বা নিজেকে নিজেই সদা সর্বদা শূন্য অবস্থায় রাখার অবস্থা যতক্ষণ পর্যন্ত না কারোর হয়েছে, এই দর্শন হবার নয়। মজার বিষয়, যিনি চোখের সামনেই সদাসর্বদা বিরাজ করছেন, আমরা তাঁকেই ভেবেছি আমাদের হাজারো লাখো ক্রোড় কপোলকল্পিত ভাবনায় আবার যথার্থতার সাধনও আমাদের

আছে। আমাদের শাস্ত্রগুলি ভরে আছে তত্ত্বের লাখো লাখো সূত্রে। তাতে আলোচ্য বিষয়, তিনি কী, তিনি কী নন—ইত্যাদি। আমরা ব্যয় করে চলেছি যুগের পর যুগ, তিনি আসলে কী রকম সেই ব্যাপারটা বুঝতে। আচার্য শঙ্কর এর সমাধান করতে চেয়ে ছিলেন তাঁর শ্লোকে। বলেছেন, যা কোটি কোটি শ্লোকে বলা হয়েছে আমি বলব অর্ধেক শ্লোকে।

বলেছেন—

"শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবঃ ব্রহ্মৈ নাপরঃ।।"

বলেছেন, ব্রহ্মই এক মাত্র সত্য। জগৎ মিথ্যা। একই সঙ্গে তাঁর কথা, "জীব ও ব্রহ্ম আলাদা আলাদা নয়"। ব্রহ্মকে বাদ দিলে জীবের আলাদা কোন অস্তিত্বই থাকে না। আমাকে বাদ দিয়ে যেমন আমার হাত, পা, বুক, পেটের কোন অস্তিত্ব থাকে না। তবুও বিভ্রান্তি আসে। হাস্যকর এই পরিমণ্ডলেই বাকবিতণ্ডা হয় বিশ্বাস-অবিশ্বাসের। কেউ বিশ্বাসী, কেউ অবিশ্বাসী। বিশ্বাসী বিশ্বাস করেন, ঈশ্বর আছেন। অবিশ্বাসী বিশ্বাস করেন না যে ঈশ্বর বলে কিছু আছে। যেন বিশ্বাসীর বিশ্বাসই ঈশ্বরের স্বীকৃতি। অথচ যে বিশ্বাসী, যে অবিশ্বাসী সবারই বাস ঈশ্বরেই। তফাৎ শুধু ঈশ্বর বিশ্বাসী ঈশ্বর সম্পর্কিত কিছু সংস্কার নিয়ে থাকেন, তাঁর নাম-গুণগান নিয়ে থাকেন আর ঈশ্বর অবিশ্বাসী থাকেন জগৎ ভাবনা নিয়ে। যুদ্ধং দেহি ভাব আছে দুপক্ষেরই।

কেউ হার মানতে চায় না। সবাই চায় জিততে। কেউই কিছু খোয়াতে চায় না। সবাই চায় পেতে। কিন্তু যুদ্ধ কার সঙ্গে? পাওয়া বা খোয়ানো সম্পদটি কী বা কে? প্রখর বাস্তবতার মধ্যেও মানুষ যেন স্বপ্নে আছে। সেই ঘোরের মধ্যেই কাটে আমাদের এক একটি দিন।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে তাঁকে অন্বেষণের সংস্কার আমাদের আছে। এই তাঁকে দেখলাম, পরক্ষণেই হারিয়ে ফেললাম— এই দেখে ফেলা, দেখেও হারিয়ে ফেলার প্রহসন আছে আমাদের। কত হরেক রকমের আত্মপ্রতারণা আছে আমাদের। যার সাধনও যুগ যুগ চলছে। বিশ্বাসের নামে, অবিশ্বাসের নামে, কত বিচিত্র রকমের মানা, কত বিচিত্র রকম না-মানা আছে আমাদের। প্রভূত বিদ্যার অধিকারী বলছেন, ঈশ্বর বলে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই— নাস্তিক পণ্ডিত-বিদুষী ঈশ্বর মানেন না। যেন কারো অস্তিত্ব কারোর মানা বা না মানার ওপরই নির্ভর করছে।

পরম সত্য স্বতোঃক্রিয়, স্বতোঃসিদ্ধ। ব্যক্তির মানা-মানির ওপর তাঁর অস্তিত্ব নির্ভর করে না। ব্যক্তির মানা-মানির পশ্চাতেও থাকে ব্যক্তিগত স্বার্থান্ধতা, থাকে ব্যক্তিগত স্বার্থ ভাবনা। যদিও ঈশ্বর সাধনার সূচনা এই ব্যক্তিবোধের বিনাশ দিয়েই। ইষ্ট সে যার যাই হোক, ঈশ্বর সাধনার শুরু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ধরে বললে, বলতে হয়— আমিত্বের মৃত্যু দিয়ে।

ঠাকুরের কথা— " আমি ম'লে ঘুচিয়ে জঞ্জাল"। (কথামৃত)

মানবের অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের সব বিধি-বিধান, আইন-কানুন, নীতি-নিয়ম, উপায়-পদ্ধতিই এই আমি-কে (আমিত্বকে) মারারই কল বা ছুতো। আন্তিব ঘুচলেই আর সব ল্যাটা চুকে যায়। কিন্তু এই আন্তিবকে মারবে কে? এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কার সাধ্য আছে আমার আমিত্বকে মারার? কারো নেই। ত্রিভূবনে আমার এই আমিত্বটিকে মারার সাধ্যটি আছে শুধুমাত্র আমার নিজেরই। ব্যাপারটা নিজের হাতে নিজেকে হত্যা করার মতো। এটি ঠিক আত্মহত্যা নয়। এটি আমিত্বের হত্যা। লক্ষ কোটি প্রাণীর হত্যাকারীও এই পরীক্ষাটিতে ফেল হয়ে যায়। শুধুমাত্র আত্মমায়ার কারণে, আত্মমোহের কারণে। সবাই নিজেকে ভালোবাসে। ভালোবাসা দোষের নয়। তবে যে কোন ভালোবাসার মোহ দোষের। কারণ মোহ পরম সত্য বুঝতে দেয় না। মোহে ম'জে থাকা মানুষ ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্দ্ধে উঠতেই পারে না। যে মানুষ ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্দ্ধেই উঠতেই পারেনি, তাঁর ঈশ্বর সাধনা ব্যক্তিগত কিছু ক্রিয়া মাত্র, তাতে পারমার্থিক কোন সার নেই। নিজেকে বাতিল করে নিজেতে স্থিত থাকার বোধ-উপলব্ধি তাই আজ পর্যন্ত সাধারণ মানবের সিংহ ভাগের সহজাত অভ্যাসে আসেনি।

যুগে যুগে ধর্মের নামে সংস্কারের ঘটা বেড়েছে, অধিকারের সত্ত্ব বুঝে নিতে পশুর মতো মারামারি, কামড়াকামড়ি, মারদাঙ্গাতেও কুণ্ঠিত হয় না মানুষ। ঈশ্বরের নামে জগতে নিজের অধিকারই বুঝে নিতে চায় মানুষ, আজও এই পৃথিবীতে। তার কত রকমের ফন্দিফিকির। কারোর ঈশ্বর বিচিত্র সব আকার-আকৃতির, কারোর ঈশ্বরের কোন আকার নেই। আবার আছেন স্বনামধন্য সব নাস্তিক।

মানুষ বই পড়ে পণ্ডিত-বিদুষী হন, মানুষ শাস্ত্র সাধন করে শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানী-ধার্মিক হন। একজন সৎ ঈশ্বরকোটির মানুষ হতে এর কিছুই কী লাগে? নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়, লাগে না। লাগে শুধু পরম সত্যের ধারণা আর আমিত্বের বিস্মরণ। আমিত্বের হত্যা—নাশ। যা দিয়েই শুরু হয় একটি পূর্ণচৈতন্যময় জীবনের পরম যাত্রা—ঈশ্বর সাধনা। ঈশ্বর সাধনা প্রতিটি প্রাণের পরমাত্ম সাধনা। এটি প্রতিটি প্রাণীর জীবন সাধনা। এটি প্রতিটি প্রাণীর ব্যক্তি সাধনাও। নিজের সাধনা এটি। তাই নিজেকেই করতে হয়। আমার খিদে পেলে যেমন আমাকেই খেতে হয়। আমার ঘুম পেলে যেমন আমাকেই ঘুমতে হয়। আমার বাহ্যি পেলে যেমন আমাকেই বাহ্যিটা করতে হয়। ঠিক তেমনি।

যুগ যুগ চলে যাচ্ছে আমাদের, এই আমিত্বময় জীবন সত্যের ছলাকলা বুঝতেই। তবুও আমিত্বের মরণটি তো হয়ই না, উল্টে এই আমিত্বই টিপে ধরে থাকে শেষ পর্যন্ত আমাদের অন্তরাত্মার গলা। আমাদের ব্যক্তিত্বের দাপটেই বস্তুত রুদ্ধদ্বার অবস্থাতেই থেকে যান আমাদের অন্তরেই অন্তরীন আমাদের নৈর্ব্যক্তিত্ব। এই সত্তাটিই আমাদের অধ্যাত্ম সাধনার পরম সাধন সত্তা। এই নৈব্যক্তিত্বে সাধনই আমাদের অধ্যাত্ম সাধন। যেন একটা না-ব্যক্তি। যা আমার ভিতরেই আছে। আমি তাকেনিয়ে ভাবি না। অথচ এই না-ব্যক্তিই আমার ঈশ্বর সাধনায় আমার একমাত্র সম্বল। জগৎব্যাপী বিদ্যার বহর, ত্রিভূবনের অপার ঐশ্বর্য, বাহুর শক্তি, সৌর্যের দীপ্তি — কোন কিছু নয়। ঈশ্বর সাধনার একমাত্র পাথেয় এই না-ব্যক্তির নৈর্ব্যক্তিত্ব।

ব্যক্তিজীবন জেরবার হয়ে যায় ব্যক্তিত্বের ঝকমকিতে, নাস্তানাবুদ হয়ে যা. জীবন—এরপরও রঙ্গ থামে না। ক্ষতবিক্ষত মুখেও কাঁটালতা চিবিয়ে যায়, চিবিয়েই যায় উট নিজেরই স্বকল্পিত মরুদ্যানে।

ফলত, দুটি ভাগে হয়ে থাকে আমাদের জীবন। এই এক জীবনেই বাস করে দুটি জীবন। একটি জীবন আমাদের ব্যক্তিত্বের চরণ ভূমি, অন্য জীবন আমাদের নৈব্যক্তির লীলাক্ষেত্র। মানুষ তার জীবিত কাল কার অধিকারে রাখবে? কাকে দেবে সে অগ্রাধিকার? কার অধিকারই বা সে কাকে দেবে? প্রশ্নটি মানুষের সমগ্র জীবৎ কালেরই।

মানুষের তাই জীবনের শেষ শ্বাসক্রিয়া পর্যন্ত চলে এই নিজের থেকেই নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার লড়াই। কার প্রভাব থেকে সে কাকে সরিয়ে নেবে। নিজ ব্যক্তিত্বের গ্রাস থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে মানুষ নিজেকি উৎসর্গ কী করবে নিজেরই নৈর্ব্যক্তিত্বের কাছে? যদি তা সে করে, মানবের অধ্যাত্ম সাধন এতটুকুই।

ঈশ্বরবাদীর ঈশ্বর তত্ত্বে-সূত্রে সমাজে ছয়লাপ। কিন্তু বস্তুবাদীর বস্তু, যা সোজা কথায় ঈশ্বরেরই শরীর। তাতেও আছে অনন্ত তত্ত্ব। প্রতিটি তত্ত্ব ও সূত্রই ঈশ্বরকেই একটু একটু করে জানার একটি একটি সূত্র। ফলত সভ্যতার আদি থেকেই মানবের সব জ্ঞান, তাঁকেই জানার প্রমাণ। আমাদের সব ধারণা, ধ্যান তাকেই বোঝার সাবুদ বা সত্যতা। তবুও ঈশ্বরবাদী ঈশ্বরকেই আত্মসাৎ করতে চান, যদিও তারা পারেন না তাদের ব্যক্তিত্বের সীমাবদ্ধতা আর ঈশ্বরের অসীমতার কারণে। বিন্দু কী করে বিভুকে আত্মসাৎ করবে? আত্মসাৎ করে ধারণ করবেই বা কোথায়? রাখবেই বা কোথায়? ধর্মের নামে জগৎ দখলের মরিয়া প্রয়াস তবু মানব বিশ্বে আজও বর্তমান।

যে ক্ষেত্রে মানুষের শক্তি মানুষেরই বিশ্বাস। বিশ্বাস কার নেই? সবার আছে। বিশ্বাস যদি মুসলমানের আছে তো বিশ্বাস হিন্দুরও আছে। বিশ্বাস খৃষ্টানের যদি থাকে তা বৌদ্ধেরও আছে, জৈন-এরও আছে। শিনাগোতে যারা ধর্ম সাধন করতে যান তারা যদি ধার্মিক হন, তবে যারা প্যাগোডায় গিয়ে প্রার্থনা করেন তারাও সমান ধার্মিক। মন্দির যদি ঈশ্বরের স্থান হয় তবে মসজিদও তাই। কিন্তু মজার কথা এখানে কারো বিশ্বাসই কারোর সঙ্গ মেলে না। যেন সবাই সবার প্রতিপক্ষ। এর কারণ ঈশ্বর সাধনা যদি এখান সাজ হয় তবে সাজের উপলক্ষ্য এখানে অন্য। সম্প্রদায়গুলিকে যদি দেখি। এদের সাজ সবারই আলাদা আলাদা কিন্তু লক্ষ্য এক। কেউ সংখ্যা বাড়ায় জগতের সবটা দখল করার ফন্দিতে, কেউ সংখ্যা বাড়ায় প্রতিরক্ষার তাগিদে। ফলত ঈশ্বর সাধনা এখানে কোথায়? এরই লেজুড় হয়েছেন বস্তুবাদীরা। তাদের ধান্দাবাজিও আছে অন্তহীন। কেউ কারোর নয়, সবাই যে যার নিজের নিজের। কিন্তু এরকম একলাযেঁড়ে জীবন কী শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হতে পারে?

বস্তুবাদের সব কাজকারবার ঈশ্বরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হাড়-মাস নিয়েই। যার নিদর্শন জগৎ। এই বস্তুকে লোটা যায়, নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেওয়াও যায়। জগৎটা এ রকমই। প্রচলিত প্রথায়, "জোর যার মুলুক তার"। যে যতটা নিজের কবজায়

রাখতে পারে, যেন ততটাই তার। কিন্তু একজন ঈশ্বরবাদীর ঈশ্বরকেও কী লোটা-বাটা যায়? না। যায় না। ঈশ্বরের কোন ভাগ-বাটোয়ারা হয় না। তাই যারাই ঈশ্বরের নামে নিজেদের ভাগের কথা প্রচার করেন। তারা ঈশ্বর সত্য জানেন না। নিয়ম-প্রথা-দস্তুর যার যাই হোক তিনি পরম সত্য জানেন না।

ব্রহ্মকমল তাঁর সমগ্র সত্তা জুড়ে ফুটে থাকে। তাঁর একটি পাঁপড়িও ছিঁড়ে আলাদা করে কুক্ষিগত করা যায় না।

তাই যিনি ঈশ্বর জানেন, তিনি কাউকে মারার বা অন্যেরটা লোটার প্ররোচনা দিতে পারেন না। না পারার কারণ, ঈশ্বর সদাসর্বদাই বিরাজ করেন তাঁর পরম অবস্থায়। ঈশ্বর সাধকও সদাসর্বদা ঐ পরম অবসআয় স্থিত থাকারই অব্যাস করেন। এর কোন ব্যত্যয় বা কোন ঊর্ধ্ব-অধঃ ঈশ্বরে বা ঈশ্বর সাধনায় হয় না। তাঁতে কোন ছেদ বা তাঁর কোন বিভাজন হয় না। ঈশ্বর যে একটি অখণ্ড সত্তা। ঈশ্বর একটি অখণ্ড অবস্থা। যা পরম অবস্থা। পরম অবস্থার কোন ভাগ বাটোয়ারা হয় না। জীব সত্তার দিক থেকে হয় তাঁর আপাত ও পরম অবস্থা। জগতেরও হয় আপাত ও পরম অবস্থা। আমিত্বের পূর্ণ নাশ না হওয়া পর্যন্ত পরম সত্য বা পরম অবস্থার আন্দাজ জীবের হয় না। জীব বিশ্বাসী হোন বা অবিশ্বাসী, আস্তিক হোন বা নাস্তিক, জীবের মন-বুদ্ধি-অহংকার-চিত্ত আটকে থাকে ঈশ্বরের আপাত অবস্থাতেই এই আপাত দিয়ে কোন কিছুর আন্দাজ হদ্রেলও পূর্ণ জ্ঞান সধারণত হয় না। এই পূর্ণকে ধারণা করার সহজ উপায় পূর্ণতে মিশে যাওয়া। একবিন্দু জল ও এক সমুদ্রে মিশে থাকে এই মিলে মিশে থাকার বিজ্ঞান বা সাধনায়। এরকম মিলে মিশে থাকলে, তখন আর ছেদ কী বিচ্ছেদ হয় না।

ঋষি যাজ্ঞবল্কের ভাষায়—

"ওঁ পূর্ণম অদঃ পূর্ণম ইদং পূর্ণাৎ পূর্ণম উদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণম্ আদায় পূর্ণমেব অবশিষ্যতে।।"

এই অবস্থায় একটি আপাত সম্পূর্ণ মিশে আছে একটি পরম ভাবে সম্পূর্ণতে। বিন্দু ভেসে আছে, বিভূতে। পরস্পর মিশে আছে বস্তুগত ভাবে, প্রাণগত ভাবে, একই সঙ্গে সতন্ত্র হয়ে আছে দুটি ভিন্ন সত্তার প্রতিভূ হিসেবে। একটি আপাত সত্তা অন্যটি পরম সত্তা। একটিকে বলা হলে জীবাত্মা, অন্যটিকে বলা হবে পরমাত্মা। জীবাত্মার চেতনায় পরমাত্মা সত্য হলে জীবাত্মা ঐ সত্যস্বরূপের সত্যতার সাক্ষীস্বরূপ। তা না হলে কে কার সাক্ষী হবে? জানাজানি, বোঝাবুঝি কী করে হবে? কে কাকে দেখবে, জানবে, বুঝবে? জীবনের সার্থকতা বা আনন্দ বা বিশিষ্ঠতা তো এই আস্বাদনের বৃত্তিতেই।

রাজারাণী আসে চলে যায়, তত্ত্বকার যুগে যুগে এসে চলে যায়, অবতারগণ আসেন, তাঁদের বলা টুকু বলে তাঁরা চলে যান। আবহমান জীবন ধারায় এঁরা এক একটি বিশেষ বিশেষ ঢেউ বা বিশেষ অবস্থা। জীবন ধারার বহু বাঁকের সূচক এঁনারা। নদীর গতির অভিমুখ বদলে দেবার অব্যর্থ আদর্শ নিয়েও জগতে এদের আবির্ভাব সময় সময় হয়। তবু এই জীবন ধারার অনন্ত কণারই এক এক বিন্দু এঁনারাও। এঁনারাও আমজনতার এক এক জন। শ্রীরামচন্দ্রের জীবনলীলা, শ্রীকৃষ্ণের জগৎক্রিয়া, অবতারদের ভূমিকার কাব্যিক ব্যাখ্যা যত বিস্তারিতভাবেই করি শ্রীরামচন্দ্রের মানুষ জন্ম, শ্রীকৃষ্ণের মানুষ জীবনটিকে অস্বীকার আমরা করতে পারি না। করা উচিতও নয়।

আবিশ্বেই আমজনতাকেই সভ্যতার দিয়াটি জ্বালিয়ে রাখতে নাটকের শেষ অঙ্ক পর্যন্ত টিকে থাকতে হয়। যারা প্রতিটি মুহূর্তেই জন্মান। এদের জন্মের শুভবার্তা নিয়ে কোন স্বর্গবাসী দূতেরই হয়তো আমাদের এই মাটির মর্ত্যে আবির্ভাব সম্ভবত হয়ও না। তবু তারাই আবহমান জীবন-সত্যের মূলধন। তারাই অগ্নি সত্যের এক একটি ফুলকি। তাই জীবনের ধারাটিকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবার দায় থাকে তাদেরই ওপর। ক্রম পরম্পরায় তারাই জীবনের ধারাটিকে এগিয়ে নিয়ে চলেন। এদের বাহিরের রঙ কালেস্রোতে বদলায়, কিন্তু ভিতরের রঙটি থাকে স্ফটিক স্বচ্ছ, চিরদিনই। বস্তুত আমরা যৎসামান্যই, ব্রহ্মের নিরিখে। আমরা সবাই প্রথমত আমআদমিই, জগতের প্রেক্ষিতে। আমিও এই আমজনতারই একজন। এই তো আমার পরিচয়। আমি যদি এই আমআদমির চোখেই দেখি ব্রহ্মকে, ব্রহ্মকমলরূপী ব্রহ্মকে! যিনি সদাসর্বদা ফুটে আছেন। তিনি ফুটে আছেন নিজেতে নিজেই। তাঁরা স্বর্গীয় শোভা, যা আমি অপলকে দেখছি, চক্ষুমুদিত করেও আমি তাঁকে তো দেখছি এই আমার পরম সৌভাগ্য। আর তো কিছু নেই আমার সামনে, কেউ নেই— তা হলে আমি আর কী দেখব? কাকে দেখব? দুচোখে আমি যা যা দেখছি সবটাই তাঁরই দেহ, তাঁরই অংশ।

যা আমাকে সুখ দিচ্ছে তা তাঁরই অঙ্গ। যা আমাকে দুঃখে বেদনায় জর্জরিত করছে তা তাঁরই অঙ্গ। যতক্ষণ আমি নিজের বোধে আছি আমার তা নিয়ে মান-অভিমান আছে। যত মুহূর্ত আমি আমার বোধের উর্দ্ধে আছি আমি এই ব্রহ্মকমলেরই রূপমাধুর্যে মগ্ন হয়ে আছি। আমার দেহের কষ্ট, মন-বেদনা সব-সবটাই আমাতে মিশে আছে। এ আমার ব্যক্তি ভাব। এই ব্যক্তি ভাবে, ব্যক্তি সত্তায় আমি চিরদিনই একা। জগতের প্রতিটি প্রাণীই এই ব্যক্তি ভাবে একা। আমরা প্রত্যেকেই একা। আমার দেহের প্রতিটি সুখ-বেদনার অনুভূতি আমার একার। এর কোন ভাগ হয় না। তেমনই পরম আনন্দ। আমার আনন্দ আমার একার — এর কোন বিমিময় হয় না। তাই আমার আছে বলেই আমি সর্বান্তকরণে চাইলেও এর ভাগীদার আমি কাউকেই করতে পারি না।

এই একা আমি আবার অনেকের সঙ্গে মেশা। ঐ অনেকও, এক অখণ্ড সত্তায় মেশা। বাইরের বস্তু সর্বস্বতার সব বিনিময় চলে এই ব্যক্তি সর্বস্বতায়। এর সব সন্ধান বা সমীক্ষা তবু শেষ পর্যন্ত ধায় পরম পানেই। এটাই দস্তুর জীবনের অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে। এ গলি, ও গলি, সে গলি তস্য গলির ব্যূহে ক্লান্ত শ্রান্ত মানুষ যখন হদিশ করে মুক্তির পরম পথ তখনই সে খোঁজে রাজসরণি। যে রাজসরণিতে গলিগুঁজির অন্ধকার, সংকীর্ণতা, সীমাবদ্ধতা — কিছু নেই। সে রাজসরণি পরমানন্দের পথ।

পরম আনন্দের বোধন প্রতিটি মানুষের অন্তরে হোক পরম সত্যের উপলব্ধি সবার হোক। বিশ্বমানবের পরম মুক্তি হোক পরমাত্ম সত্যের নিত্য দর্শনে, উপলব্ধির সদাস্ফুর্তিতে, আনন্দে। বিশ্বাস বাতিক বা অবিশ্বাসের ছেনালিতে নয়, পরমসত্য সর্বদা প্রত্যক্ষ হোক জ্ঞানে, উপলব্ধির শক্তিতে। ধ্যানের একাগ্রতায় মানুষ আত্মস্থিত হোক পরম বিশ্বাসে। যে বিশ্বাস কাউকে বা কোন কিছুকেই নিছকই স্বীকৃত করার বা দেওয়ার স্পর্ধা বা আদিখ্যেতা করে না, করে সত্যসত্যের সদা ধ্যান, পরম ধারণা। যে ধারণায়, আস্থায়, স্বার্থ সিদ্ধ হলেই অতিবিশ্বাস পরক্ষণেই স্বার্থ ব্যাহত হলেই দ্যোদুল্যমান উৎকণ্ঠায় চরম অবিশ্বাসের ভাববিলাস নেই। আছে পরমাবস্থা। এই পরম অবস্থায় থেকেই মানুষ তাঁর জগৎ জুড়ে ফুটে থাকা ব্রহ্মকমলটির স্বরূপ উপলব্ধি করতে থাকুক আজীবন, আমৃত্যু।

—ঃঃ—

আমিই আছি

শিপ্রা ব্যানার্জী

আমি আছি বলেই তুমি সুন্দর,
আমি আছি বলেই তুমি অনন্য;
আমি আছি বলেই তোমার
ডানা মেলে উড়ে চলা—
আমি আছি বলেই তোমার
খ্যাতির শিখরে ওঠা।
আমি আছি বলেই তোমার
নিরালয়ে চলে সারস্বত সাধনা—
আমি আছি বলেই তোমার
নিশ্চিন্ত মনে পথ চলা—
আমি আছি বলেই সংসারে
নিরাসক্তভাবে দিন যাপন করা,
আমি আছি বলেই তোমার
মোহমুক্ত জীবন যাপন,
আমি আছি বলেই জীবনে তোমার
রাজর্ষির রূপ ধারণ—
আমি আছি বলেই চলে তোমার
অবিরাম বেদস্নান—
আমি আছি বলেই তোমার
দৈবী সত্তায় যুক্ত হওয়া।
ঈশ্বরের আশীর্বাদ ধন্য তুমি
তাই, সব সম্ভব তোমা দ্বারা।

—ঃঃ—

সম্পাদকের সংযোজন ঃ 'আমি'র দাপট ভগবানকে দূরে ঠেলে দেয়।

প্রভু গ্রহণ করো

সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)

তোমার শ্রীচরণে এসে
করজোড়ে নতমস্তকে
মুদ্রিত নয়নে অর্পিত
সমর্পিত সবই
বেশকিছু সময় এমনই
একইভাবে
এখন তো ঘরে ফেরার পালা
ফিরে যাওয়ার সময়
এই জন্ম আর জীবন
সমগ্র সুতোয় আর জালে
হাজার বন্ধন
ভাবি, যদি ওইভাবে একইভাবে
আবার জড়িয়ে যাই
অক্টোপাসের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে
সংসার সমুদ্রে আর
ফিরে আসি উৎকণ্ঠিত হয়ে
তোমার দুয়ারে
প্রভু গ্রহণ করবে তো আমায়
সহস্র অক্ষমতা সংকোচ সংকীর্ণতায়
এই মনুষ্য জন্ম আমার।

—ঃঃ—

শান্তি প্রদায়িনী মা

ভক্তিপ্রসাদ

মা হলেন আমাদের জাগতিক পরিচিতজনের মধ্যে সবচেয়ে আপন। তিনি আমাদের মঙ্গল কামনা করেন, আমাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তাঁর সর্বস্ব দিয়ে সন্তানকে প্রতিপালন করার জন্য তিনি লড়াই চালিয়ে যান। অবিরত তাই তিনি মা, নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাওয়ান, সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল সন্তানের মনের ভয় তিনি দূর করেন। তিনি সর্বদা সন্তানকে অভয় দেন। তিনি তাকে আশ্বাস দেন যে তিনি আছেন। সন্তানকে নিজ দেহে ধারণ করে কিছুকাল পরে তাকে এই পৃথিবীর আলো দেখানো এবং পরবর্তীকালে এই পৃথিবীতে বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তোলা—এসবই মা করেন তাঁর সহজাত প্রবৃত্তির গুণে। কারণ যিনি যে মা। সন্তানকে যত্ন করা, তার ভয় দূর করা— তাঁর কাজ, কোন কারণে চিন্তার ঘন কালো মেঘ যখন সন্তানের মনকে আচ্ছাদিত করে এখন কেবলমাত্র মা তাকে আশ্বাস্ত করার চেষ্টা করেন। মা এর এই আশ্বাসবাণী সন্তানের মনে শান্তি এনে দেয়। ঘোর সঙ্কটের মধ্যেও সে মনে করে আমার মা আছে। সে নিশ্চিন্ত হয়। বার্ধক্যের ভারে ক্লান্ত মা যখন সন্তানকে জিজ্ঞাসা করেন যে সে খেয়েছে কিনা — সেটা সন্তানের কাছে এক চরম শান্তির বার্তা বহন করে আনে।

মা সকলের। যে সন্তানের পেটে যা সয় তিনি তাই রান্না করেন। কে সৎ, কে অসৎ — মা এসব বিচার করেন না। সকল সন্তান তার কাছে অভিন্ন। পশু পাখির মধ্যেও সন্তান স্নেহ অতি প্রবল। সকল সন্তানকে সাধ্যমত খাদ্য সরবরাহ করা, শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তাকে আগলে রাখেন মা। সন্তানও জানে মা কিছু একটা ব্যবস্থা করবেনই। তাই সে নিশ্চিন্ত। নারী যখন মা হয়ে ওঠেন, তখনই তার মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর দায়িত্ব বোধ গড়ে ওঠে।

সেই সঙ্গে তাঁর মধ্যে যে চিরকালীন কোমলতা যাকে সব মিলিয়ে কোনো নারী জাত, পাত, আকার নির্বিশেষে মা হয়ে ওঠেন। একবার দেখা গেছে ছোট ছোট তিনটি কুকুরছানা মা এর দুধ খাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু দুধ পাচ্ছে না। রাস্তা দিয়ে একটি লোক যাচ্ছিল। সে এসে দেখল মা কুকুরটি মারা গেছে। তার দেহ থেকে আর দুধ নির্গত হচ্ছে না। তখন ঐ লোকটি কুকুর ছানাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেন। তাই সন্তান সবসময় জানে আমার মা আছে। তার মার ওপরে একটা দাবী আছে। একবার একটা পেঁচাকে দেখা যাচ্ছে সে তার ডানার আড়ালে সন্তানদের ঢেকে রেখেছে। এমনই স্নেহময়ী মা। মা এর কাছেই সন্তানের সব আবদার। মা সারদা সারা দিন কর্মব্যস্ত থাকতেন সন্তানদের জন্য খাবার সরবরাহের জন্য। তিনি বলেছেন যে তিনি সত্যিকারের মা। তিনি বলেছেন যে তিনি সতের ও মা, অসতেরও মা, এমনকি একটা পোষা টিয়াপাখী যিনি ঐ পাখীটিরও মা, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কোনো নারীকে মা বলে ডাকার মধ্যে আমরা লাভ করি অপার শান্তি, এখানে নারীর বয়স কোনো বিচার্য বিষয় নয়। নারীকে মা বলে ডাকার শান্তি লাভ করতে চায় সকলে। সব দায় দায়িত্ব মা এর উপর ন্যস্ত করে সন্তান নেচে গেয়ে জীবন অতিবাহিত করতে চায়। সন্তানের মনে এই আনন্দের উৎস হলেন মা। একজন পথক্লান্ত পথিক গ্রীষ্মের দুপুরে একটি গাছের তলায় বসে আরাম অনুভব

করে। গাছের ফল খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করে। ধরণা বা পুকুরের জল খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করে। নরম ঘামের উপর শুয়ে বিশ্রাম নেয়। গরুর দুধ খেয়ে শক্তি বর্ধন করে। সমগ্র নারীজাতির মধ্যে মাতৃদর্শন করে। এভাবেই তার মনের অশান্ত ভাব দূর হয়। প্রকৃতি মারই মা। এই বোধ তার ক্রমশঃ হয়ে থাকে। শাসন এবং স্নেহ — এই উভয় দানের মাধ্যমে সন্তান প্রতিপালনে প্রকৃতি হয়ে ওঠে তৎপর। যথেচ্ছ বৃক্ষছেদনে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করার শাস্তি হিসাবে তাপপ্রবাহ, বন্যা ইত্যাদি যেমন মানুষ করে। যেমনই বৃষ্টির স্নেহধারায় ভোগ স্নাত হয়ে। সে অনুভব করে শান্তি। মা শাসন করে এই কারণে যাতে সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবন সুখের হয়। ভবিষ্যতে সে যেন ভালো থাকে। সুখে থাকে, শান্তিতে থাকে। তাই প্রয়োজনে মা সন্তানকে শাসন করেন। আবার পর মুহূর্তেই তাকে স্তন দুগ্ধ দান করে শান্তিদান করেন। এই মানসিকতা লাভ করতে পুরুষ কোনদিন পারবে না। তাই নারীর সৃষ্টি হয়েছে। এই মা এর কোনো আশ্রয় লাভই সন্তানের একমাত্র লক্ষ্য হোক।

—ঃঃ—

অনির্বাণজীর চরণপ্রান্তে

আশুরঞ্জন দেবনাথ

১০-১০-৭২ তারিখে স্বামীজির ৬-১০-৭২ তারিখের লেখা চিঠি পেলাম। লিখেছেন— "... আশাকরি বেরিয়ে যাবার আগে এ চিঠি পেয়ে যাবে। ৮ই নভেম্বর বিকালে তোমার প্রতীক্ষা করব। স্নেহাশিষ রইল। অনির্বাণ ..." স্বামীজি সাধারণত লিখেন অমুকদিন বিকালে এস কিংবা আসতে পার। 'তোমার প্রতীক্ষা করব'— একথা কোনদিনই লিখেন নি। অর্থাৎ এবারের দেখা একান্তই প্রয়োজন? এরপর কি স্বামীজিকে পাব না? নতুবা কেন এ সাগ্রহ প্রতীক্ষা। চিঠিটা পেয়ে অবধি এসব কথা কেবলি ভাবছি; আর মনে মনে স্থির করেছি— যেতেই হবে এবং আট তারিখেই। *** *** বেড়িয়ে ফিরেছি অক্টোবরের শেষের দিকে। এসে দেখি আমাদের 'বঙাল খেদা' বাইরে শান্ত, কিন্তু ভিতরে ভিতরে জ্বলছে তুষানল। তবুও সাহস করে মায়ের নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ৪র্থ ..... বেলা একটা গাড়ীতে। স্বামীজি প্রতীক্ষায় আছেন, সুতরাং আমায় যেতেই হবে — সে যত বিপদই আসুক। *** ***

বুধবার, ৮ই নভেম্বর -বিকাল চারটা।— যথারীতি দুরুদুরু বক্ষে ফার্ণ রোডের ৯/২নং বাড়ির ত্রিতলে কলিং বেলের বোতাম টিপলাম। দরজা খুললেন স্বামীজির সেবিকা এক ভদ্রমহিলা, তার পিছনে পিছনে যিনি এলেন সে ভদ্রমহিলা আমার পূর্ব পরিচিতা— মানে স্বামীজির কাছে যেতে আসতে তিনি আমায় অনেকবার দেখেছেন, আমিও দেখেছি। তাঁরই আহ্বানে ঘরে গিয়ে বসলাম; তিনি পাশের ঘরে স্বামীজিকে আমার কথা বলতেই স্বামীজি— আমায় ডেকে পাঠালেন। সেখানে স্বামীজির প্রতীক্ষায় আরেক ভদ্রমহিলা ছিলেন।

স্বামীজির ঘরে এলাম; বিছানায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে পাশে মোড়ায় বসলাম। শুভ্র শয্যায় শায়িত স্বামীজির তনু দেহ খানি এবারে আরও ক্ষীণ, দুর্বল, অশক্ত; সুরেলা কণ্ঠস্বরও ক্ষীণ— প্রায় অস্পষ্ট। যারজন্য এবারকার কথাবার্তা অনেকটাই বুঝতে পারিনি। একী দেখছি! তবে কি বিদায় আসন্ন? বেদনায় কণ্ঠ রুদ্ধ, বুক ভার হয়ে এল। *** *** স্বামীজির ডান পাশে আমি, বা দিকে স্বামীজির এক ছাত্রী,— সেন্ট্রাল পার্কের বাসায় তরুণী ভদ্রমহিলাকে দেখেছি স্বামীজির নোট নিতে; তাই চিনেছি, ক্ষীণ অস্পষ্ট কণ্ঠে স্বামীজি জিজ্ঞাসা করলেন কবে এসেছ, কবে ফিরবে ইত্যাদি যেমনটা প্রতিবারই জিজ্ঞাসা করেন। তারপর একটু থেমে *** *** হরিদ্বারে গঙ্গা দেখতে পাওনি *** *** বললাম, না; আমরা যেদিন গেলাম সেদিন থেকেই গঙ্গার জল সবটুকু নীল-ধারা দিয়ে বইয়ে দিয়েছে; ব্রহ্মকুণ্ড একেবারে শুকনো, শুধু নুড়ি আর পাথর ভর্তি। *** 'আনন্দময়ীকেও পাও নি'; বললাম , 'না'; 'কোথায় গিয়েছিলে'; *** নৈমিষারণ্যয পূজায় মা ওখানেই ছিলেন, আমি যেদিন সকালে গিয়ে পৌঁছেছি, তার আগের আগের দিন সন্ধ্যায় মা বেনারস চলে গেছেন। সুতরাং আর দেখা হয়নি। (প্রসঙ্গতঃ এখানে বলে রাখি কলকাতায় যাওয়ার আগে স্বামীজিকে এক চিঠিতে সব লিখেছিলাম। স্বামীজি তারইসূত্র ধরে কথা শুরু করছেন এবং সাধারণতঃ তাই করেন ও।) খানিকক্ষণ চুপচাপ ইতিমধ্যে স্বামীজি তাঁর সেবিকাকে ডেকে পা টা একটু উঁচু করে ঠিক করে দিতে বললেন। ঠিক হলে ও পাশে বসা ছাত্রী স্বামীজির পদসেবা করছেন। ঘর নীরব; বেদনা বিধুর। ক্ষীণকণ্ঠে স্বামীজি বললেন, 'বল তোমার কি বলার আছে'। কিন্তু কি বলব; সব বলা আমার ফুরিয়ে গেছে। কণ্ঠ রুদ্ধ; চিত্ত বিহ্বল — 'ওগো দেবতা! তবে কি সত্যই বিদায় আসন্ন!' *** স্বামীজি আবারো বললেন, 'বল কি বলবে *** ***' এরই মধ্যে সেই পূর্ব পরিচিতা ভদ্রমহিলা এসে বললেন, 'অমুক (পাশের ঘরে যে ভদ্রমহিলাকে বসে থাকতে দেখে এসেছি; কি নাম বলেছিলে তা এখন মনে করতে পারছি না) বসে আছে, আসতে বলব? শুনে স্বামীজি একটু জোরেই বললেন, 'না, ওকে একটু বসতে বল; ওতো রোজই আসতে পারবে। ও (আমি) অনেকদূর থেকে এসেছে; ওর সাথে আর হয়তো দেখা হবে না।' শুনে অন্তরাত্মা যেন কেঁপে উঠল; অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে বললাম, 'না স্বামীজি, আমি আবার আসব।' 'এসে আমায় নাও পেতে পার'। 'পাব; আপনি ইচ্ছা করলেই *** *** *** ' বলতে বলতে ম্লান হেসে চোখ তুলে দেখি পদসেবারতা ছাত্রীর মুখেও তেমনি ম্লান হাসি,— যেন বলতে চাইছেন আমরা তো পারিনি, আপনি যদি বলে কয়ে রাজী করাতে পারেন। না আমিও পারিনি । কথা শেষ না হতেই স্বামীজি প্রতিবাদ করলেন, 'না, তা হয় না। আমি পারি না *** *** ***,' তাছাড়া এভাবে পড়ে থেকে কি লাভ; সবারই তো কাজকর্ম

রয়েছে *** (অর্থাৎ স্বামীজির জন্য কেউ এতটুকু ব্যস্ত থাকুক এটা তিনি চান না। জীবনে তো কারো কোন সেবা নেন নি তাই আজ এত কুণ্ঠা)। একটু থেমে স্বামীজি আবারো বললেন, 'বলে, কত কি বলবে বলে ভেবে এসেছ...'? বললাম, 'কিছু বলার নেই, ভেবেছিলাম আপনাকে আরও সুস্থ দেখব'। 'কেন , আমি তো ভালই, প্রশ্ন কর, দেখবে ফেল করব না।' বলতেই সবাই হেসে ফেললাম; পরিচিতা সেই ভদ্রমহিলাও ছিলেন। তিনি বললেন, 'হাসতে ইচ্ছা করছে?' *** ***
'আর কতকাল থাকব; বয়স তো হয়েছে'। 'রবীন্দ্রনাথ তো আরও বেশিদিন ছিলেন; এখনো তো আছেন আনন্দময়ী মা, গোপীনাথ কবিরাজ।' *** রবীন্দ্র প্রসঙ্গ তুলতেই প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজি বললেন, 'তার পরে দাড়াত সম্মুখে/ বলো অকল্পিত বুকে—/ *** শান্তি সত্য, শিব সত্য *** *** ইত্যাদি (যতদূর মনে পড়ছে) বললাম, শেষ অবধি তো রবীন্দ্রনাথও দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারেননি; তাই প্রশ্ন করছেন 'তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?' 'এটা দ্বিধা নয়; দৃঢ় প্রত্যয়। কতগুলি প্রশ্ন আছে তারমধ্যেই জবাবও থাকে'। *** বললম, 'তার মনে দেখা দেবেই।' স্বামীজি বললেন 'হ্যাঁ, তাই।' তবে যে আবার শেষ বয়সে' শেষ লেখায় 'প্রথম দিনের সূর্য/প্রশ্ন করেছিল *** *** পেল না উত্তর'। ওটা তোমরা বোঝনি। আজকালকার সব অধ্যাপকরা কিছু না বুঝেই আবোল তাবোল সব ব্যাখ্যা করেন। রবীন্দ্রনাথকে তংার নিবিড় সান্নিধ্যে না এলে বোঝা কঠিন; প্রমথ বিশী এসেও বুঝতে পারেনি। শেষ বয়সে রবীন্দ্র নাথের দ্বিধা সত্য (ভগবান) সম্পর্কে আসেনি; কিছুটা এসেছিল এই জগৎ সম্পর্কে; সে কথা তিনি তাঁর সভ্যাতার সঙ্কট ভাষণে বলেছেন, "*** আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি— পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম— ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট — সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তুপ। ***" মৃত্যুর কয়েকদিন আগেও মুখে মুখে বলেছেন তাঁর শেষ কবিতা—"*** তোমার জ্যোতিষ্ক তারে/ যে পথ দেখায়/ সে যে তার অন্তরের পথ,/ সে যে চিরস্বচ্ছ, / " *** *** কিংবা 'যতবার ভয়ের মুখোষ তার করেছি বিশ্বাস/ ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।' *** *** জীব-জগৎ-ব্রহ্ম। ব্রহ্ম একটা বড় ছাড়পোকা, তুমি একটা ছোট ছাড়পোকা আর জগতটা হল অসংখ্য ছাড়পোকার সমষ্টি। তুমি নিজেকে জানতে পার, ব্রহ্মকে জেনে ব্রহ্ম হতে পার; জগতে সম্ভবতঃ জানা যায় না, — জানা বড় কঠিন।

নিরাশ হইও না; পাবে। আমি যাব কোথা? তোমাদের মধ্যেই থাকব। আমি তো কখনো ভাবি না যে আমার মৃত্যু হবে— আমি চিরকালই ছিলাম, আছি, থাকবও। *** গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন এ বিশ্বসংসারে অতিঅল্প লোকই আমায় চায়, যারা চায় তাদেরও অতি অল্পই আমায় পায়। তুমি পাবে *** *** এতকাল তো সাধনায় অবিচল রইলে। ক'জন তা পারে? তোমার বন্ধুরা তোমায় রাজনীতিতে ভিড়াতে কি চেষ্টাই না করছে! তুমি যে সে মোহে পড়নি এ তাঁরই প্রসাদে। *** বললাম, স্বামীজি, এ যাবৎ আপনি আমায় যত চিঠি লিখেছেন তার সাথে দিব্যজীবন প্রসঙ্গ, যোগ সমন্বয় প্রসঙ্গ মিলিয়ে আমি আমার পথ তৈরী করে নিব; আপনি আশীর্বাদ করুন— বলতে বলতে গলা ধরে এল, মাথা নত করলাম স্বামীজির শয্যা উপরি"। স্বামীজি আবেগজড়িত কণ্ঠে হাত বাড়িয়ে মাথায় বুলাতে বুলাতে বললেন, 'হ্যাঁ পারবে, খুব পারবে'। *** এরিমধ্যে প্রায় এক ঘণ্টা হয়ে এল; এবারে উঠতে হয়। আরেক ভদ্রমহিলা অপেক্ষা করছেন। *** জিজ্ঞাসা করলাম, স্বামীজি, আপনি দিব্যজীবন-প্রসঙ্গে, ও যোগ সমন্বয় প্রসঙ্গে যা বলেছেন জীবন রহস্যের এরচেয়ে সুন্দরও সাবলীল ভাষ্য সম্ভবতঃ হয় না। তিনি অত্যন্ত সহজ ভাবে জবাব দিলেন, 'কি জানি, কি করে বলি'। উঠে আসতে ইচ্ছা করছিল না; তবুও উঠতে হল। বললাম, 'স্বামীজি, এবারে আমি।' হ্যাঁ. এস; তারপর ব্যথিত কণ্ঠে বললেন, আরেকটি মেয়ে অপেক্ষা করছে; মেয়েটি বড় দুঃখী। ওকে আসতে বলে যেও।' বিছানায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম; স্বামীজি মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করলেন। মাথাতুলে শেষ বারের মত মিনতি জানালাম, 'স্বামীজি, যেখানেই থাকুন না কেন আপনার স্নেহদৃষ্টি থেকে যেন বঞ্চিত না হই।' 'আমি কোথায় যাব; আমি তোমাদের মধ্যেই থাকব'। *** থাকছেন আর কই? আপনি ইচ্ছা করলেই আরও থাকতে পারেন। *** 'না তা হয় না। *** রামকৃষ্ণকেও তার ভক্তদের বললেন, বলেছিলাম মা ওরা বলছে যেন কিছু খেতে পারি। তা মা বড় লজ্জা দিলেন; তোদের দেখিল বললেন এতমুখে খাস, তবুও তোর খাওয়ার আশা মিটল না! বড় লজ্জা পেলাম রে; মাথা আমার হেট হয়েগেল।' *** *** *** বলতে বলতে স্বামীজির আবেগজড়িত কণ্ঠ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এল। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। স্বামীজি এবারে স্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, "তা হলে এবারে তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।' *** *** আমার বলার কিছু ছিল না। রুদ্ধ কণ্ঠে বেদনা বিধুর হৃদয়ে ধীরে ধীরে বেড়িয়ে এলাম। *** *** প্রভু! এই কি তবে শেষ দেখা? জীবনের নানা অশান্তক্ষণে ছুটে এসেছি তোমার শ্রীচরণ প্রান্তে; তুমি স-স্নেহে আশ্রয় দিয়েছো, ভুলিয়েছো সমস্ত ব্যথা-বেদনা। এরপর আমি কোথায় যাব, কে আমায় আশ্রয় দেবে! প্রভু, এখনো যে আমার অনেক বাকী; জীবন পাত্র যে আমার আজও অপূর্ণ রয়ে গেল। আজও যে আমার জীবনে তোমার আমন গভীর অন্ধকার।

ব্যথিত হৃদয়ে ঘরে ফিরে এলাম। এসে পেলাম তাঁর আস্বাস বাণী *** *** ১৭/১১ তারিখে লিখেছেন, আশু, সাধনার পথে তোমার অন্তর্যামীই তোমার চিরসঙ্গী হয়ে ও চির সহায় এতদিন তোমার সাধনায় তুমি যে অবিচল থাকতে পেরেছ. এ তাঁরই প্রসাদে। আমি চলে গেলেই তুমি নিঃসম্বল হয়ে পড়বে এ-কল্পনা দূরে ছুঁড়ে ফেল। আমি কোথায় যাব? তোমার মধ্যেই থাকব। 'মা শুভ)।' স্নেহাশিস।" ***

১/১২ তারিখে লিখেছেন *** "তুমি ভাল আছ জেনে আনন্দ পেলাম। তোমরা যদি আলো দেখতে পাও, শ্রীকৃষ্ণের মত স্থিতধী হতে পার, তবেই আমার জীবনের সার্থকতা। ভাল থেকো। স্নেহাশিষ রইল।

অনির্বাণ "

—ঃঃ—

সত্যের পথ

প্রাপ্তিস্থান ঃ কোলকাতা ও অন্যত্র।

(1) বেলঘরিয়া 1 No. Platform, কোলকাতা – 56

(2) বেলঘরিয়া 2 No. / 3 No. Platform
কোলকাতা – 56

(3) বারাকপুর রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে।

(4) **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,** নৈহাটি রেল স্টেশন
4 No./5 No. Platform

(5) **গীতা সাহিত্য মন্দির**
হালিশহর রেল স্টেশন 2 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(6) **বাপ্পা বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে
(কল্যাণী লোকাল যে Platformএ দাঁড়ায়) নদীয়া

(7) **শ্যামল বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন 1 No. Platform, নদীয়া

(8) **সাধনা বুক স্টল**
বারাসাত রেল স্টেশন 3 No. / 4 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(9) ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন Platform, হুগলী

(10) **জৈন বুক স্টল**
শ্রীরামপুর রেল স্টেশন 4 No. Platform, হুগলী

(11) শিয়ালদহ রেল স্টেশন (নর্থ), কোলকাতা

(12) **রতন দে বুক স্টল**
যাদবপুর মোড়, কোলকাতা

(13) **সন্তোষ বুক স্টল**
নাগের বাজার, কোলকাতা

(14) **শ্যামা স্টল**
টালীগঞ্জ মেট্রোর সামনে, কোলকাতা

(15) **তপা চক্রবর্তী,** চিড়িয়ামোড়, কোলকাতা

(16) গোলপার্ক মোড়, কোলকাতা – 29

(17) **বিরাটী রেলওয়ে বুক স্টল,** কোলকাতা

(18) **সর্বোদয় বুক স্টল**
হাওড়া স্টেশন

(19) লেকটাউন থানার নীচে
কোলকাতা – 89

(20) বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ের উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(21) বাগবাজার মায়ের বাড়ীর উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(22) **বাবু বুক স্টল**
সিঁথির মোড়, কোলকাতা

(23) **দমদম ক্যান্টনমেন্ট বুক স্টল**
কোলকাতা

(24) **কালী বুক স্টল**
শোভাবাজার মেট্রো, কোলকাতা

(25) **সুব্রত পাল**
সল্টলেক পি.এন.বি., ব্লক-বি.এ., কোলকাতা।

(26) **সল্টলেক** 4 No. **ট্যাঙ্ক,** কোলকাতা

(27) **নস্কর বুক স্টল,** AB/AC মার্কেট (সল্টলেক)

(28) **নরেশ সাউ,** বৈশাখী মোড়, কোলকাতা।

(29) **দেবাশিষ মণ্ডল,** জি.ডি. মার্কেট, সল্টলেক

(30) **আশিষ বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(31) **চ্যাটার্জী বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(32) **টি দত্ত,** কুমার আশুতোষ (মেন) স্কুলের পাশে

(33) **মন্মথ প্রিন্টিং**
জপুর রোড, দমদম, কোলকাতা-৭০০ ০৭৪

(34) **পণ্ডিত এস. কে. ব্যানার্জী,** বিশিষ্ট পুরোহিত
দেশবন্ধুপাড়া, বৌবাজার, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০৪
মোবাইল ঃ ৮৯৭২৮০৭৮৫৪, ৯০৬৪৬৩৬১০২

SATYER PATH
1st April 2025
Chaitra–1431
Vol. 22. No. 12

REGISTERED KOL RMS/366/2025-2027
Regn. No. WBBEN/2006/18733

Price : Rs. 5/-

দিব্য সাধন ঃ পার্থিব জীবনেই ঈশ্বরলাভ

বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, ব্রহ্মসূত্র ও ভাগবত গীতা অবলম্বনে

আলোচনায় ঃ অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্-লাইনে দিব্য জীবন ও সাধনার ক্লাস চলছে ঃ—

রবিবার : ৬ই এপ্রিল, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ১৩ই এপ্রিল, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ২০শে এপ্রিল, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ২৭শে এপ্রিল, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

প্রতি রবিবার বিকাল ৫-৩০ থেকে ৭-০০ পর্যন্ত।

যে কোন ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগ দিতে পারেন **Android Phone**-এর অথবা কম্প্যুটারের সাহায্যে।

অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য **Invitation** দরকার।

যদি ইচ্ছা হয় তবে যোগাযোগ করুন ঃ—

শ্রী এস. হাজরা ঃ ৯১৬৩৩৯৩৬৩৩

আপনার **email id,** নাম ও **Phone Number SMS** করে পাঠান।

Website দেখুন ঃ **www.satyerpath.org**

স্থান : ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি (চতুর্থ তল)
কলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ : ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

Printed and Published by Bibudhendra Chatterjee, Printed at Classic Press, 21, Patuatola Lane, Kolkata–9 and Published at Satyer Path, 21, Patuatola Lane, Kolkata–700 009.
Editor : Dr. Ramaprosad Banerjee, DL-11/5, Salt lake City, Kolkata–700 091.